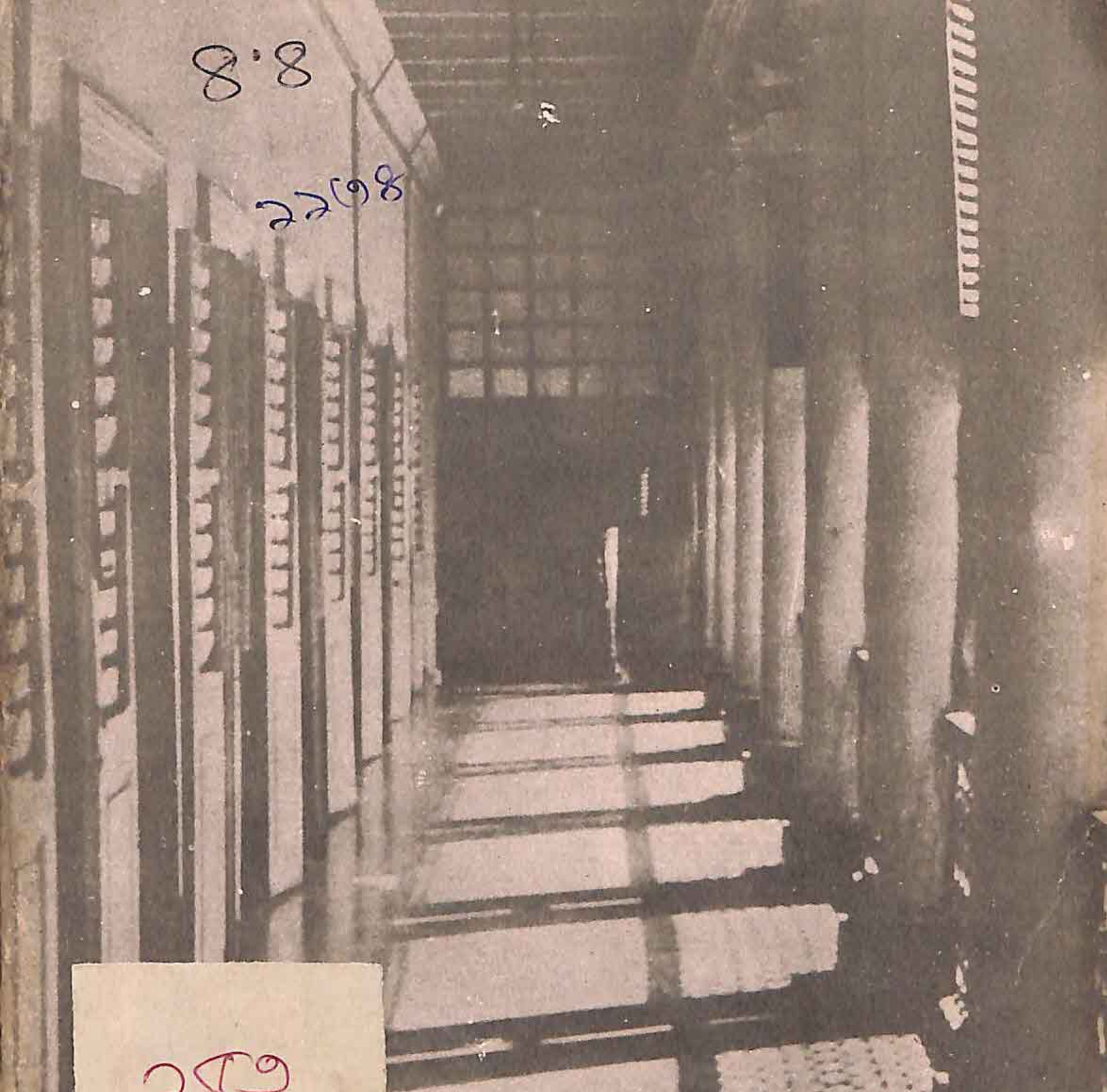


জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

লীলা মজুমদার

NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

1979 (*Saka* 1901)
Reprinted 1985 (*Saka* 1907)

আলোক চিত্র : শম্ভু সাহা, সত্যেন বিশী ও বিশ্ব-ভারতীর সৌজন্যে
রবীন্দ্রনাথের রচনা : বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

প্রচ্ছদের ছবি : জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বারান্দা
শেষ প্রচ্ছদের ছবি : কাঁচের মন্দিরের অভ্যন্তর

THE JORASANKO HOUSE (*Bengali*)

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi 110016 and printed at Jupiter Offset Press, 10/3-B, Jhilmil Industrial Area, Shahadra, Delhi 110032.

নেহরু বাল পুস্তকালয়—43

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

(রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা)

লীলা মজুমদার

অনুবাদ

কমলা চট্টোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি



এক

উত্তর কলকাতার একটা কানাগলির শেষে অদ্ভুত ধরনের এক বাড়ি সকলের চোখে পড়ত। সে বাড়িতে অনেক আঁকা-বাঁকা সিঁড়ি উঠে হঠাৎ এক-একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে থেমে গিয়েছে। আনাচে কানাচে অভাবনীয় সব জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেত ছোট ছোট বারান্দা, কিম্বা খোলা ছাদ—প্রায় প্রত্যেকটারই মেঝে উঁচুনীচু, অসমান। অবশ্য সামনের দিকের ঘর ও বারান্দাগুলি ছিল খুব চওড়া আর লম্বা ; তাদের মেঝে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো আর উঁচু জানলার সার্সিগুলো রঙিন কাঁচের তৈরি। বাড়ির বাইরে আরো কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ি, বাগান, তার চারদিকে ফুলগাছের বেড়া আর কাঁকর বিছানো পায়ে চলার রাস্তা। সমস্ত বাড়িটা ঘিরে ছিল উঁচু পাঁচিল, ঐ অন্ধ গলিটার দিকে দুটি বিরাট ফটক।

পাড়ার লোকে নাম দিয়েছিল 'ঠাকুরবাড়ি'। সেই দুশো বছর আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ের বাড়ি, ঠাকুর পরিবার এখানে একটানা বসবাস করেছে ; মাঝে মাঝে দরকার মতো এখানে ওখানে ঘর বারান্দা বাড়িয়েছে। এই পরিবারটির আসল পদবী 'ঠাকুর' কিন্তু কালক্রমে সে নাম 'টেগোর' এ পরিণত হয়েছে।

ইংরেজদের সময় কি ভাবে দিশী নামের অদল বদল হয়েছিল তা শুনতে বড় মজা লাগে। যেমন, বর্ধমান হল বার্ডওয়ান, চুঁচুড়া হল চিন্সুরা, মিত্র হল মিটার আর ঠাকুর হল টেগোর। ঠাকুরদের কিন্তু 'টেগোর' নামটি

ভালই লেগেছিল তাই তাঁরা ইংরিজিতে পদবী লিখবার সময় 'টেগোর' লিখতেন। তবে আজ পর্যন্ত বাঙলায় 'ঠাকুর' লেখা হয়।

এমন কি ঐ ছোট্ট কানাগলিটা ও তার শিবমন্দিরটিও বহুকালের পুরনো। আজ পর্যন্ত সেখানে অতীতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। গলিটা যেখানে অপরিসর বড় রাস্তায় এসে পড়েছে তার-ই কোণায় এক সময় একটা ভাঙ্গা বাড়ি দেখা যেত। রাস্তার উপর খোলা সদর দরজার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ত ছোট্ট একটি উঠোন। সেখানে সারি দেওয়া পিতলের দাঁড়ের উপরে বসে থাকত কতরকমের রঙ-বেরঙের পাখি—লালমোহন, হীরামোহন, কাকাতুয়া। তাদের কর্কশ চিৎকার আকাশ বাতাস ভরিয়ে রাখত। সমস্ত পাড়াটাই যেন কিরকম অস্বাভাবিক ছিল।

একশো বছর আগের এক বর্ষামুখর দুপুরে ফুটফুটে একটি ছেলে জানলা দিয়ে বাইরের জলে প্লাবিত গলিটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার পরণে ছিল সাদাসিধা সুতির কাপড়, পায়ে সস্তা চটি। চুলগুলো অপেক্ষাকৃত লম্বা, একটু যেন অগোছাল চেহারা। অনেকে বলত, ছেলের থেকে মেয়ের মতই দেখতে বেশি। একবার স্কুলের এক বন্ধু রটাল যে, ও আসলে ছেলেদের পোশাক পরা মেয়ে। ব্যাস! পরীক্ষা করবার জন্য বন্ধুরা মিলে তাকে চায়ের নেমন্তন্নে ডাকল। সেখানে একটা উঁচু বেঞ্চি থেকে তাকে লাফাতে হল, কারণ সবাই শুনেছিল মেয়েরা বাঁ পা আগে ফেলে। ছেলেটি লাফিয়েছিল বটে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত চায়ের নেমন্তন্নের কারণটি তার অজানা ছিল। ঐ ছেলেটির নাম রবীন্দ্রনাথ, সংক্ষেপে রবি।

সেই বর্ষার দুপুরে আট বছরের রবি তার মাস্টারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল আর মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করছিল যেন এত জল দেখে তিনি আজ না আসেন। কিন্তু আশায় নিরাশ করে ঠিক সময়মতো গলির মোড়ে তাপ্পিমারা কালো ছাতাটি দেখা দিল। তখন নিরুপায় হয়ে নিচের তলার ঘরটিতে, আবছা আলোয় বসে, ঘুমে ভরা চোখে রাত অবধি পড়তে হল—

ইংরিজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল। এমন কি, একটি নরকঙ্কাল ঘেঁটে শরীরের হাড়গোড় সম্বন্ধেও তাকে শিখতে হত। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাস্টারমশাই চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘুমও যে কোথায় উবে যেত, কে জানে!

ছোট ছেলেটিকে বাড়ির ভিতরের এক বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে হত, যেখানে তেলের বাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেয়ালে অদ্ভুত সব ছায়ার সৃষ্টি করত। ঐ সময়টাতে বারান্দা খাঁ খাঁ করত। শুধু মাঝে মধ্যে দাসীরা উঠোনের ধারে সারি দিয়ে বসে রান্নাঘরের আর শোবার ঘরের তেলের বাতির জন্য সলতে পাকাত।

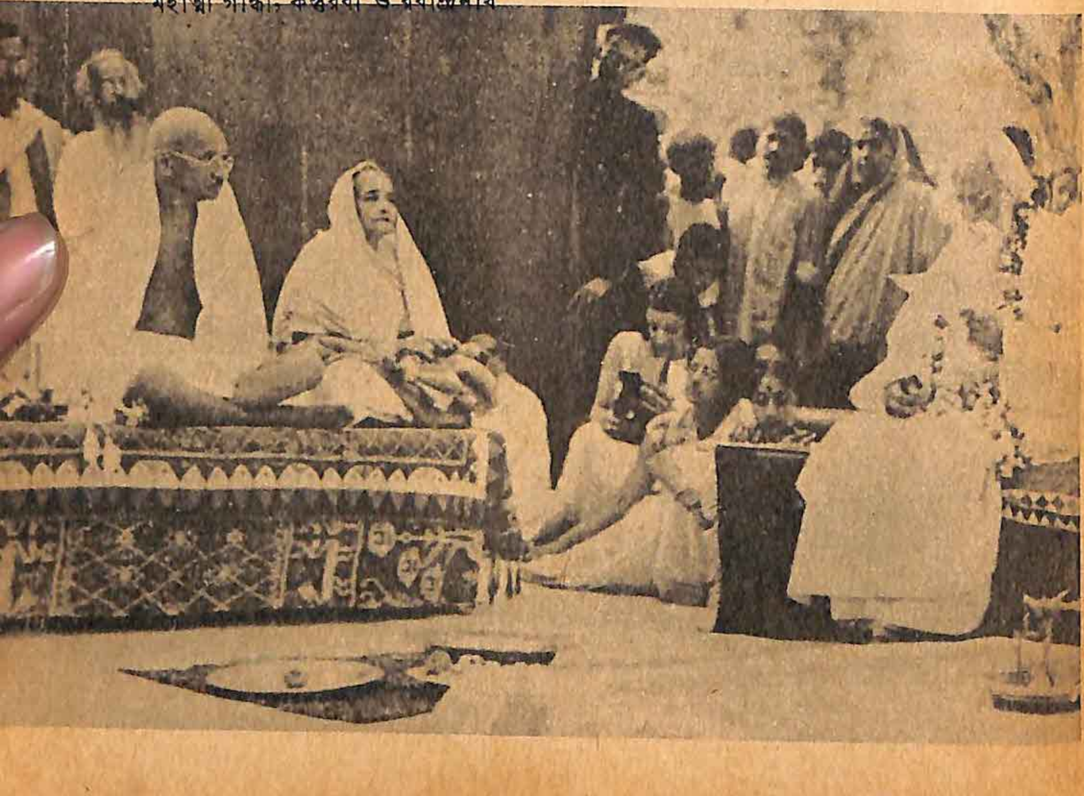
সে সময় বিজলীবাতি ছিল না। এমন কি গ্যাস বাতিও অতটা খ্যাতি পায়নি। কলের জলও ছিল না। নিচের তলার একটি আলোবাতাসহীন অন্ধকার ঘরে বড় বড় জালায় ভরে সারা বছরের পানীয় জল রাখা হত। ঐ ঘরটার দিকে নজর পড়লেই ছোট্ট রবির গা শিউরে উঠত। অবশ্য বাড়ির অন্যান্য কাজের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যেত, কারণ, খাল বেয়ে গঙ্গার জল চলে আসত বাড়ির পিছনের ছোট বাগান ও উঠোনে। জোয়ারের সময় রবি অবাক হয়ে দেখত সূর্যের আলোয় নাচতে নাচতে কলকল করে বাড়ির ভিতরে জল ঢুকে আসছে। মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট মাছ জলের তোড়ে ভেসে এসে জ্যাঠামশায়দের বিলিতি মাছের পুকুরে লাফিয়ে পড়ত। রবির প্রাণটাও ঐ মাছগুলোর সঙ্গে লাফিয়ে উঠত।

লোকে-লোকারণ্য বাড়িটা, সত্যিই বড় আনন্দের জায়গা ছিল। বাবা, মা, কাকা, কাকীমা, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা, তাদের বন্ধুরা, শিল্পী, গানবাজনার মাস্টার, লেখক ইত্যাদিতে গমগম করত। এ ছাড়া অনেক-গুলি মাইনে করা লোকদের জন্যও থাকার বন্দোবস্ত ছিল বাড়ির আনাচে-কানাচে। কেরাণী, সরকারমশাই, পিয়ন, দাসদাসী এমন কি দর্জি- ধোপা ও স্যাকরারও আলাদা আলাদা ঘর ছিল। বাড়িটা যেন একটা ছোট্ট শহর বিশেষ।

রবি পুরো বাড়িটা কখনো ঘুরে দেখেনি। একতলা, দোতলা, সামনে চওড়া কাঠের সিঁড়ি, পিছনে পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি, ছোট্ট উঠোন, আরো কত কি!

উঠোনের ধারে একটি ছোট ঘরে ইংরিজি 6 মে 1861 সালে রবির জন্ম হয়। সে ছিল মায়ের চতুর্দশ সন্তান। কয়েকজন ভাইপো, ভাইঝিরাও তার থেকে বয়সে বড় ছিল।

মহাত্মা গান্ধী, কস্তুরবা ও রবীন্দ্রনাথ



রবির ভাগ্নে সত্য, বড়দিদির ছেলে, তার থেকে সামান্য বড় ছিল। সত্য আর রবির ঠিক উপরের ভাই সোমেন্দ্র ছিল তার খেলার সাথী। রবির জীবনটাকে এই সত্যই রসে-রহস্যে ভরে রাখত। একদিন সত্য খুব গম্ভীর গলায় বলল, "শান্তিনিকেতনে কখনো যেওনা।"

রবি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেন না? বাবা যান, বাবার বন্ধুরা যান। বাবার বাড়ি আছে, সেখানে তুমিও গিয়েছ।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে ভীষণ বিপজ্জনক ব্যাপার, প্রাণটি হাতে করে সেখানে যেতে হয়।"

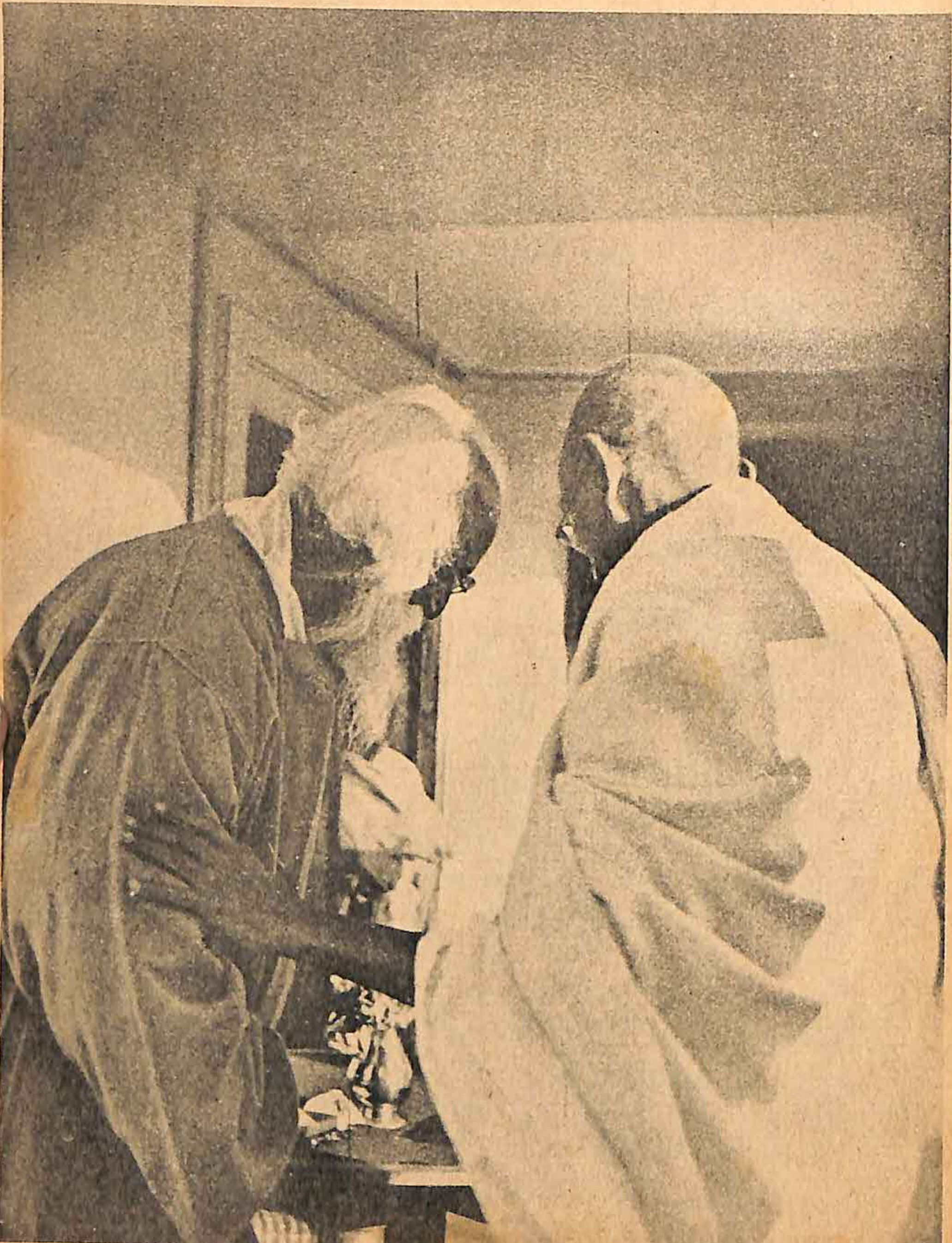
"তার মানে?"

"ঐ ট্রেন একটি মারাত্মক জিনিস। হুড়হুড়, হুদ্দুর করে, ঝাঁকিয়ে ছুলিয়ে যাত্রীদের এদিক থেকে ওদিকে ছুঁড়ে দেয়। একেবারে যে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় না, সেটাই রক্ষে।"

রবি শিউরে উঠল। "কিন্তু জায়গাটা? শান্তিনিকেতন কি রকম জায়গা?"

"চমৎকার জায়গা, স্বপ্নপুরীর মতো। বাড়ি থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে তার উপর কোন ছাদ নেই, অথচ সেখান দিয়ে হেঁটে গেলে গায়ে রোদ কিম্বা বৃষ্টির জল লাগে না।"

রবি বড় হয়ে জীবনের বেশির ভাগ সময় ঐ শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছিল। সেখানে নিজে যে স্কুল খুলেছিল সেটি এখনো রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অঙ্গ হিসাবে। মহাত্মা গান্ধী নিজে ঐ বিদ্যালয় তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন।



রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে এই বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন গান্ধীজী আফ্রিকা থেকে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে চলে এসেছিলেন। এরা শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস থেকে লেখাপড়া করেছিল।

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত ছিলেন যে শিশুদের গড়ে তোলা চাই প্রকৃতির বুকের মধ্যে। খুব সাধারণ পরিবেশে। তারা নিজেরা নিজের কাজ করতে শিখবে ও অপরকে সাহায্য করবে। তাদের প্রধান কর্তব্য হবে, আমাদের ভারতবর্ষের যেসব পুরনো অথচ অতি সুন্দর ঐতিহ্য ও শিক্ষা-প্রণালী রয়েছে, সেগুলিকে ফিরিয়ে আনা। শুধু তাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে মিলাতে হবে শারীরিক বলিষ্ঠতা। তাই দিয়ে দেশের ও দশের সেবায় লাগতে হবে।

দুই

তখনকার কালের বনেদী পরিবারের ছেলেদের মতো রবিও যতদিন শিশু ছিল, তার জীবনটা কাটত দাসদাসীর সঙ্গে আলাদা মহলে। মায়ের সঙ্গে দেখা হতো রাত্রে শুতে যাবার সময় আর অসুখ বিসুখ করলে। বাবাদের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ আরো কম হত। তাদের খাওয়ানো দাওয়ানো ও সাধারণ দেখাশোনার ভার চাকরদের হাতে ছিল, তাদের প্রধান কাজ ছিল ছোটদের বাবা-মায়ের এলাকার বাইরে রাখা। ছোটদের ভাগ্যে খুব মামুলি খাওয়া জুটত আর বোঝানো হত যেন বড়রা এসব বিষয়ে ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন। কিন্তু এই দাসদাসীরা সবসময় রামায়ণ ও মহাভারত পড়ত, শুনে শুনে রবির সে সব কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

রবির চাকর তাকে খাবার দিয়ে জানলার ধারে বসিয়ে, খড়ি দিয়ে চারিদিকে গণ্ডী কেটে বলত, "ছোটবাবু, এই গণ্ডীর মধ্যে থাকলে তোমার কোনো ভয় নেই। এর বাইরে গিয়ে সীতামায়ের কি হয়েছিল মনে পড়ে তো? কেমন সেই বিকট রাক্ষস এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছিল!"

এই বলে চাকরটি চলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে আসত। সে খুব ভাল করেই জানত যে ছোট্ট রবি ভয়ের চোটে ঐ গণ্ডীর বাইরে আসবে না। রবি জানলার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে দেখত ছোট্ট পুকুরটার ধার ঘেঁসে কেমন একটি বিরাট বটগাছ গজিয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত পাড়ার লোকে ঐ পুকুরে স্নান করতে আসছে আর বটগাছটার ছায়া

পুকুরের জলে কেমন আলো-অন্ধকারের লুকোচুরি খেলছে। চোখ তুলে দেখত বাড়ি আর গাছপালা আর তারও উপরে খোলা নীল আকাশ। সব দেখতো চোখ মেলে আর মনের কোণায় সব গুছিয়ে জমা করে রাখত। বহু বছর পরে পুকুরের ধারে ঐ বটগাছটি নিয়ে সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিল রবি। এখন সেই পুকুরও বুজে গিয়েছে আর ঐ বটগাছও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু রয়ে গিয়েছে ঐ বাড়ি আর সেই জানলা দেওয়া ঘরটি। আর রয়েছে রবির বইগুলি, ছেলেবেলার বিষয় কবিতাগুলি।

রবির যখন অক্ষর চিনবার বয়স হল, তখন তাকে দাসদাসীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এবার বাবা, মা, ভাইবোনদের সঙ্গে তার ভাল করে আলাপ-পরিচয় হল। বড়দাদাদের আয়োজিত গানের আসরে বা থিয়েটার দেখতে কত নামকরা লোকেই না আসত, রবি তাদের ভাল করে লক্ষ্য করে দেখত। ছোটদের অবশ্য এসব ব্যাপারে আদৌ আসার কথা ছিল না। এমন কি দর্শক হিসেবেও নয়, শুধু কোন বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া। কিন্তু আসল দিনের তোড়জোড়ের দর্শক হতে তাদের বাধা ছিল না। গানের সুর শোনা, বাজনার তার বাঁধা বা অভিনেতাদের গলার আওয়াজ শোনাতেও কোন বাধা ছিল না।

নাটকের দিন, বারান্দা থেকে কিম্বা উপর তলার জানলা থেকে গলা বাড়িয়ে রবি দেখত বাবা কাকাদের নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসছেন চকচকে জুড়ীগাড়ি চড়ে, তাদের ঘোড়াগুলোর কি চমৎকার চেহারা! রবির দাদারা বেরিয়ে এসে অভ্যাগতদের গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে, ছোট্ট ছোট্ট গোলাপের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছেন। সৌখীন ইংরাজ সাহেব তাঁদের মেমদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এমন কি একবার-দুবার স্বয়ং বড়লাট এসেছিলেন। এ সব কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার!

সেই সময় কলকাতার নামকরা অভিজাত পরিবারের মধ্যে ছিল 'ঠাকুর পরিবার'। কলকাতায় এবং বাইরে নানান্ জায়গায় তাঁদের জমিজমা,

বাড়িঘর ছিল। তাঁরা ছিলেন ধনী, শিক্ষিত ও অত্যন্ত নব্য-ভাবাপন্ন। রবির ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর দেশে-বিদেশে স্বনামধন্য ছিলেন। ইংলণ্ডে অকালে মারা যাবার পর রবির বাবা দেবেন্দ্রনাথ পরিবারের কর্তৃত্ব নিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতের একজন প্রবর্তক। তাঁর পরিবারের মেয়ে-বৌরা বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম অন্দর মহলের পর্দার বাইরে এসেছিলেন ও আধুনিক নিয়মানুসারে লেখাপড়া করেছিলেন। এই মহিলারাই সে যুগের মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশী আচার অনুষ্ঠান ও দেশী ঐতিহ্যের কদর শেখাতে এঁরাই অগ্রণী হয়েছিলেন।

ছোট্ট রবির পক্ষে তখন এ সব ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু সে খুব ভাল করে এটুকু বুঝেছিল যে তার বাবার বাড়িতে যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলি খুবই অসাধারণ ও বিস্ময়কর। দুঃখের বিষয় তার বেশির ভাগ সময় কেটে যেত একটানা জ্ঞান অর্জনে ; তার ফলে, আরো রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি উপভোগ করবার সময় থাকত না। এমন কি, তার খেলার সাথীর রটানো গুজব যে ঐ বাড়ির মধ্যেই একটি রাজপ্রাসাদ লুকানো আছে, সেটাকে পর্যন্ত খুঁজে বের করবার সময় পেত না।

রবি তার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি সেটা দেখেছ ?" সে উত্তর দিয়েছিল "আমি এক্ষুণি সেখানে গিয়াছিলাম।" রবি কোনদিন সেই প্রাসাদ খুঁজে পায়নি কারণ সেটি ঐ সঙ্গিনীর মনের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও ছিল না।

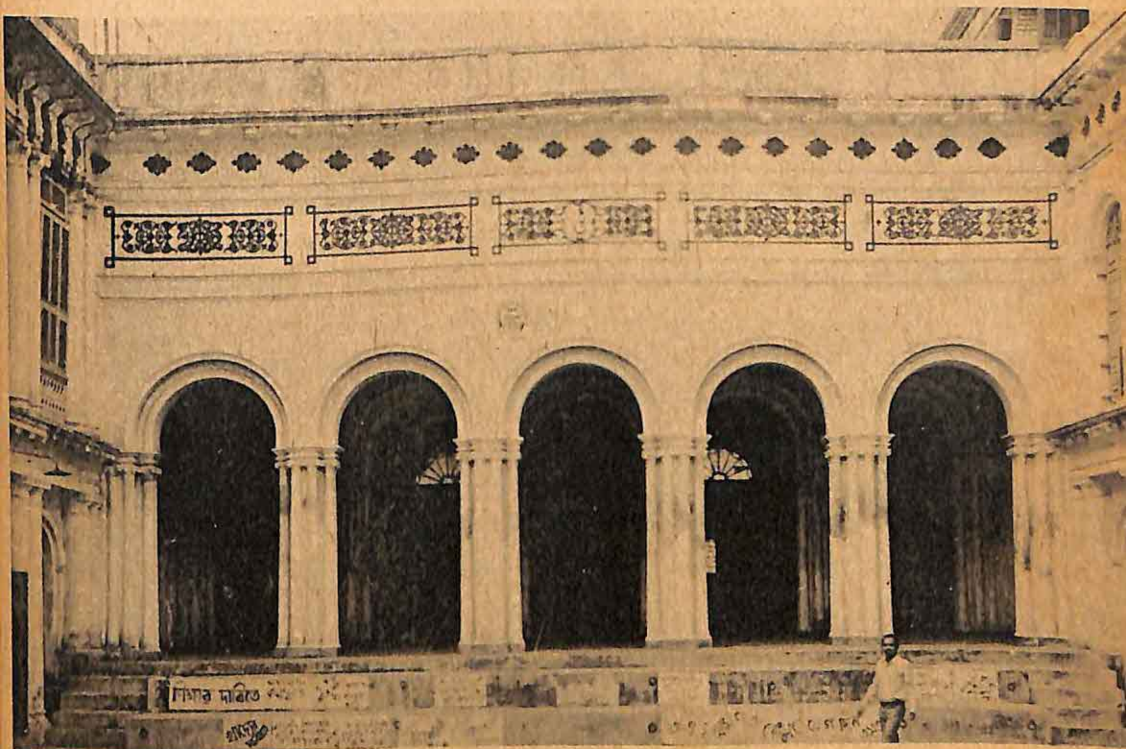
প্রথম প্রথম রবি স্কুলে যাবার জন্য খুব আগ্রহী ছিল। রোজ সকালে যখন ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াত সত্য আর সোমেন্দ্রকে স্কুলে নিয়ে যাবার

জন্য, তখন রবিও ভীষণ কান্না শুরু করত। শেষ পর্যন্ত বড়রা মত দিলেন আর রবিও স্কুল গেল।

বাড়ির পুরনো মাস্টারমশাই রেগে তার গালে এক চড় বসিয়ে বললেন, "অপেক্ষা কর, সেদিনের আর দেরি নেই যখন তুমি এর থেকেও বেশি জোরে কাঁদবে স্কুলে না যাবার জন্য।"

আর ঠিক তাই হয়েছিল। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত রবির স্কুল ভাল লাগেনি। অতগুলো ছেলের সঙ্গে একটা ঘরে বসে একই জিনিস বই আর মানচিত্র থেকে পড়া তার অসহ্য লাগত। কোনো স্বাধীনতা নেই, প্রকৃতি

জোড়াসাঁকোর পুরানো পূজামণ্ডপ



আর খোলা আকাশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। খেলাধুলা পর্যন্ত মাস্টারদের নিয়মে বাঁধা ছিল।

রবি স্কুল ফাঁকি দেবার ফন্দি খুঁজতে লাগল। বড়দাদাদের আরবী ফার্সী পড়াবার বুড়ো মুন্সীজীকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে স্কুলের মাস্টারমশাইর জন্য চিঠি লিখিয়ে নিত যাতে স্কুলে যাওয়া থেকে সেদিন রেহাই পায়। এই চালাকি প্রায়ই সফল হত। অথচ বাড়িতে রবি বিজ্ঞান ও ছবি আঁকা শিখতে খুব ভালবাসত।

কবিতায় ব্যবহার করা শব্দের মধ্যে যে সুর পাওয়া যায়, এ কথা উপলব্ধি করে রবির মন খুশিতে ভরে যেত। তার ভিতর থেকে একটি অদ্ভুত তাগাদা এল যে তাকেও লিখতে হবে। একটি ছোট্ট নীল রঙের পকেট বইতে সে কয়েক লাইন করে কবিতা লিখতে শুরু করল। এই বই তার সঙ্গে ঘুরত। সত্য ও সোমেন অবাক হয়ে সেই লেখা পড়ল, তাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। তারা সবাইকে দিয়ে সেই লেখা পড়াল।

ক্রমে সেই ছোট খাতাটার পাতাগুলো ভরে উঠতে লাগল আর বন্ধুমহলে রবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তার মাস্টারমশাই পর্যন্ত পড়ে খুব প্রশংসা করলেন। ক্রমে কথাটা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের কানে পৌঁছল। তিনি রবির কবিতার খাতা পড়ে একটু হেসেছিলেন।

কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এসব সম্ভবপর হোতো না। রবির এক ভাইপো তাকে মাত্রা ও ছন্দের ব্যবহার শিখিয়ে দিয়ে কবিতা লিখে যেতে বলেছিল।

রবি তাই করেছিল। তার ফল খুব একটা খারাপ হয়নি। তাছাড়া সোমেন ও সত্য সব সময় তাকে উৎসাহ দিয়ে আসত।

তিন

স্কুল রবির বাস্তবিক অসহ্য লাগত। দুষ্টু ছেলেদের কি কঠিন শাস্তিভোগ করতে হত। প্রায়ই তাদের রোদে, দুপাশে লম্বা করা হাতে দুটো থান ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দৈবাৎ যদি হাত থেকে ইট পড়ে যেত, তাহলে আরো কঠিন সাজা দেওয়া হত। রবি নিজে দুষ্টুছেলে ছিল না তাই তাকে সাজা পেতে হত না, কিন্তু অন্যদের ঐ কষ্ট দেখে তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করত।

রবির বড় দুঃখ হত। এই দুঃখ ভুলবার জন্য রবি তার নিজস্ব একটি স্কুল খুলল। দোতলার একটি নির্জন বারান্দার রেলিংগুলো হল তার ছাত্র। সে ছিল খুব কড়া মাস্টার, প্রত্যেক ছাত্রের মুখ চিনত। কেউ কেউ ছিল বেজায় বেয়াদব, কারো ছিল গোমড়া মুখ। না পিটালে তাদের কিছু শেখানো যেত না। তাই রবি খুব উৎসাহ সহকারে এই কাজে লেগে গেল। ফলে শিগ্‌গীরই তারা নড়বড় করতে আরম্ভ করল, আর ঐ খেলাও বন্ধ করে দেওয়া হল।

রবি এবার আরেকরকম খেলা শুরু করল। একতলায় চাকরদের ঘরের কাছে গাড়িবারান্দার তলায় একটা পুরনো পাল্‌কি থাকত। তাতে কেউ চড়ত না, কিন্তু দরজাগুলো খোলা বন্ধ করা যেত, আর কিছু কিছু কারু-কার্যে তখন পর্যন্ত জৌলুশ ছিল। ভিতরে তাকিয়া ফেটে তুলো বেরিয়ে

পড়েছিল, তবু একটা ছোট ছেলে তার মধ্যে বসে দরজা বন্ধ করে, অনায়াসে কল্পনা করতে পারত যে পালকি চলেছে গভীর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আটজন কাহারের কাঁধে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য হিংস্র জানোয়ার, আর ওঁত পেতে রয়েছে অন্যান্য অজানা বিপদ! হঠাৎ ডাকাতের দল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে রক্তবর্ণ চোখে, তীক্ষ্ম অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে, চেঁচিয়ে উঠল, 'রে-রে-রে!' ভাগ্যিস দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারলেই রবি একদম নিরাপদ!

ওদের বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ আলাদা জগতে থাকতে হত। গান-বাজনা, বই, থিয়েটার, স্বদেশী কাজকর্মে ভরা রোমাঞ্চকর বড়দের জগত থেকে সেটা ছিল অনেক দূরে। দশ বছরের ছেলেদের মাঝে মধ্যে বড়দের কথার টুকরো বা আতিথেয়তা কানে আসত ও চোখে পড়ত। তারা এইভাবে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিল, অনেক লোককে চিনতেও পেরেছিল।

ঠাকুররা সেইসময় বাঙালী সমাজের মাথা ছিলেন। সকলে তাঁদের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকত। তাঁরা জানতেন স্বদেশে ও ইউরোপে কি কি গুণ প্রশংসনীয় আর জানতেন নিজের দেশের কি কি প্রয়োজন। তাঁদের কাছ থেকে রবি শিখেছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক ভাষার আবশ্যকতা। কিন্তু রবি এও শিখেছিল যে সমস্ত ভারতীয় শিক্ষার মূলে থাকা চাই শাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারতের জ্ঞান।

রবি সম্মান দিতে শিখল দেশের পুরনো ধর্ম, ঐতিহ্য, আদর্শ, প্রথা ও আচার ব্যবহারকে। সে জানত উন্নতির অনেক উপায় রয়েছে কিন্তু শুধু বিদেশী আদব-কায়দা নকল করা অত্যন্ত মূর্খের কাজ; অবিশ্যি তাদের ভাল জিনিসটি গ্রহণ করা উচিত।

রবি রামায়ণ ও মহাভারতকে আগেই ভালবাসতে শিখেছিল। এখন সে

পড়তে আরম্ভ করল শোবারঘরের কাঁচের আলমারিতে বন্ধ পুরনো বাঙলা বইগুলো। বইগুলো পাবার জন্য তাকে ঠানদিদির আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা চুরি করতে হত। ছুটির দিনে লম্বা অলস দুপুরে, রবি বাড়ির মহিলাদের গল্পের বই পড়ে শোনাত। সে সময় তাঁরা সেলাই বা পান তৈরি বা আচার তৈরি করতে বসতেন। গল্পগুলোর মধ্যে অনেক বিদেশী গল্পের অনুবাদ ছিল। বাড়ির মেয়েরা ও তাঁদের নবীন পাঠক সকলে একসঙ্গে ঐসব গল্প শুনে হেঁসে-কেঁদে আকুল হত। রবির মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠত, "ওর মত অত কম বয়সে কে এত লেখাপড়া করেছে!"

স্কুল পছন্দ না হলেও এবং স্কুল পালানো সত্বেও লেখাপড়ার হাত থেকে রবি নিস্তার পায়নি। তাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হত। তার সেজদাদা রবির লেখাপড়ার তদারক করতেন। সারাদিন ধরে শিক্ষা চলত। এক মাস্টারের পর আরেক মাস্টার আসতেন। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ছবি আঁকা, গানবাজনা—কিছুই বাদ যেত না।

শরীর চর্চার উপর খুব নজর দেওয়া হত। বাড়ির বাইরে ঘেরা জায়গাটার এক কোণায় যথারীতি বন্দোবস্ত করা ছিল। সেখানে ছেলে-যুবকরা কুস্তি করতে শিখত নামকরা কুস্তিগীরদের কাছে। দেখতে দেখতে তাদের গা তেলামাটিতে ভরে যেত কারণ জায়গাটা ভাল করে সর্ষে তেল ঢেলে তৈরী করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত বাড়ির সেই জায়গার মাটিতে তেলতেল ভাব রয়েছে।

রবির মায়ের এসব একেবারেই পছন্দ ছিল না। তিনি বলতেন, "একে রবি আমার সকলের থেকে কালো তার উপর ঐ তেলামাটিতে ওর রঙ আরো খারাপ হয়ে যাবে।" ফরসা, সুন্দর রবি নাকি অন্যান্য ভাইবোনদের থেকে কালো ছিলেন।

রবিবার কুস্তি শেখা হত না। সেদিন একটি ছোট চৌকিতে বসিয়ে রবির

মা তেল ও সুগন্ধী মলম মাখিয়ে মাখিয়ে ছেলের গা থেকে বিদঘুটে তেলামাটি তুলতেন। রবির নিজের খুব মজা লাগত।

এক একদিন সারা বাড়ি গানবাজনায় গমগম করত—দেশী, বিদেশী, লঘু ও উচ্চ সব রকমের সঙ্গীত। সারা পরিবার ছিল সঙ্গীত-রসজ্ঞ, কারো কারো চমৎকার গানের গলাও ছিল। রবি নিজে একবার শুনেই যে কোনো সুর তুলে নিতে পারত।

রবির দাদা-দিদি-বৌদিরা কিন্তু তার স্কুল না যাওয়া নিয়ে আক্ষেপ করতেন আর বলতেন, "ছেলেটার কিছু হবে না।"

রবির বাবাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হত বলে তার লালন-পালনের ভার বড়দাদাদের উপর ছিল। যদিও দেবেন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জেনে রাখতেন।

রবি তার গম্ভীর, ধর্মপরায়ণ বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করত। তিনি দেখতেও যেমন সুন্দর, তেমনই পণ্ডিতলোকও ছিলেন। তার উপরে একজন নামকরা সংস্কৃতজ্ঞও ছিলেন। কিন্তু রবি তাঁর কাছাকাছি কখনো যেতে পারত না, কারণ বাড়ির সকলে তাকে সরিয়ে রাখত, পাছে ঐ মহাপুরুষকে সে জ্বালাতন করে।

একবার দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছেন, এমন সময় গুজব উঠল যে রুশরা হিমালয় পেরিয়ে এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে।

রবির মা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। "রুশরা ঐখান দিয়েই ঢুকবে। সেখানে তোমার বাবা বেড়াতে গিয়েছেন। রবি, লক্ষ্মী ছেলে, বাবাকে শীগ্‌গির লিখে দাও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে।"



রবীন্দ্রনাথের বাবা—দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর

রবি নায়েবমশায়ের সাহায্য নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। কি করে বাবাকে লিখতে হলে চিঠি আরম্ভ করতে হয় ও কি করে শেষ করতে হয় নায়েবমশাই সব দেখিয়ে দিলেন। চিঠি পাঠানো হল ও যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পোঁছেও গেল। তারপর, অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় যে তার উত্তরও এল বাবার নিজের হাতের লেখায় এবং রবির নামে, "কোনো ভয় নেই, যদি রুশরা মুখ দেখাতে সাহস করে, আমি নিজে তাদের তাড়িয়ে দেব।" সারাজীবন ধরে রবির মনে ছিল বাবার হাতের লেখা চিঠি পাওয়ার সেই আনন্দ!

সেই সময় রবি ও-বাড়ির একজন নেহাতই নগণ্য প্রাণী ছিল। নিজের পরিবার ছাড়া বাইরের কেউ তার কথা শোনেনি, শুধু স্কুলে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল

তারা ছাড়া। সেখানেও কেউ তাকে আমল দিত না কারণ পড়াশুনায় সে খুব সাধারণ ছিল। রবি খুব শান্ত ও বাধ্য ছেলে ছিল কিন্তু তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না।

ঠাকুর পরিবারের পুরুষদের জীবন সামাজিক ও স্বদেশী ব্যাপারে কর্মমুখর ছিল, কিন্তু ছোটরা বড় একটা বাড়ির বাইরে যাতায়াত করত না। জোড়াসাঁকোর বাড়িটাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট বড় ও রহস্যপূর্ণ ছিল; চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার কোনো অভাব হত না। একবার ঐ পুরনো পালকিটার ভিতর বসলেই রবি সঙ্গে সঙ্গে নানান্ রোমাঞ্চময় ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ত।

ঐ বাড়িতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব লোকের আনা-গোনা হত আর কত রকমের অস্বাভাবিক সব ব্যাপারই না ঘটত! একবার একদল লোক রন্-পা চড়ে এসে দেখিয়ে দিয়ে গেল 40 ফুট উঁচু পাঁচিল একলাফে ডিঙিয়ে কি করে ডাকাতরা চলে যেতে পারে। আরেকবার একজন লোক এসে বাজি ধরে 20 সের কাঁচা মাংস খেয়ে গেল। এ সবের চাইতে বেশি আর কি একটা ছোট্ট ছেলে চাইতে পারে?

চার

একবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বাইরের জগতটাকে দেখবার সুযোগ হল। কলকাতা শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী দেখা দিল। বড়রা স্থির করলেন পরিবারের কেউ কেউ ছোটদের নিয়ে শহরের বাইরে স্বাস্থ্যকর কোথাও চলে যাবেন। ছোট্ট রবি ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন।

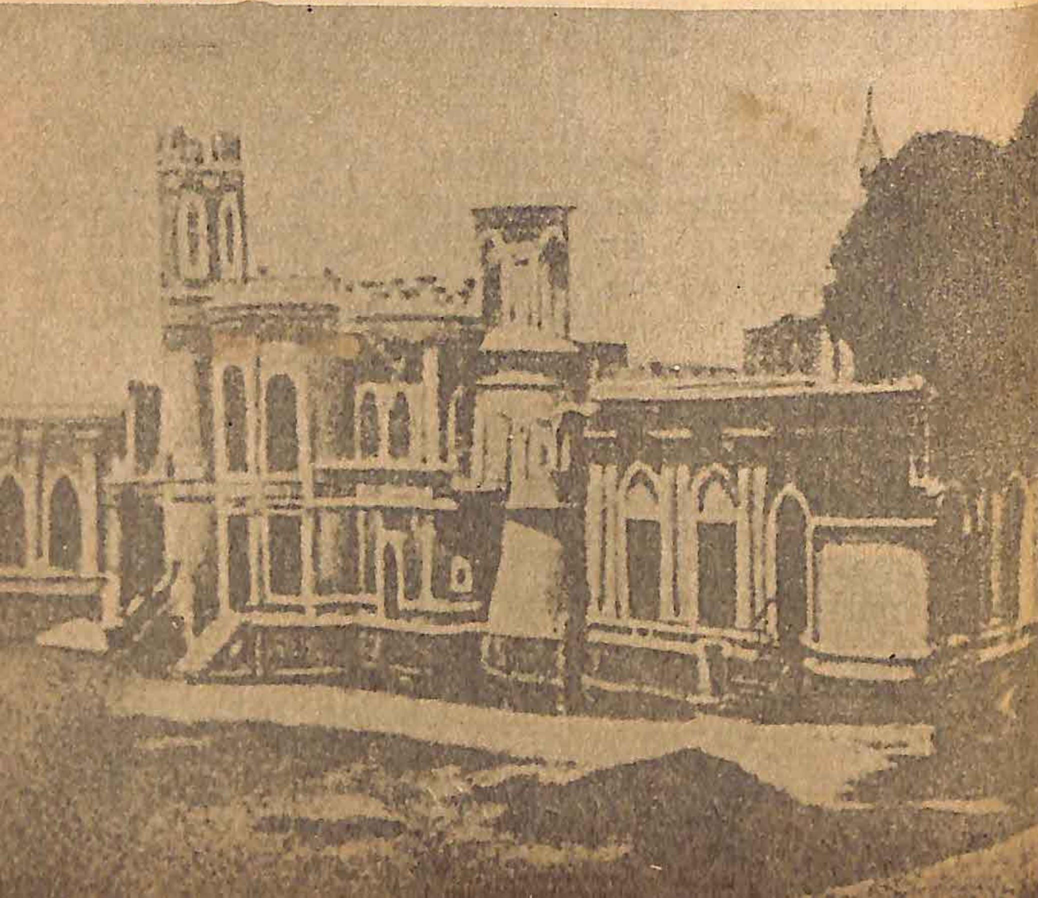
বেশি দূর অবিশ্যি যাওয়া হয়নি সেবার। কয়েক মাইল উত্তরে হুগলী নদীর উপর পেনেটিতে যাওয়া ঠিক হল। সেখানে নদীর ধারে ফুলগাছ, ফলগাছ, পুকুরে ভরা বিরাট বাগানবাড়িতে সকলে রইলেন। রবি এত সুন্দর জায়গা কল্পনাও করতে পারে নি। বহুবছর পরে নিজের স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, "সেদিনকার সেই বাগানবাড়ির রোদে রাঙা দিনগুলি, রোজ সকালে আমার মনে সোনালী পাড় দেওয়া চিঠির মত এসে পৌঁছয়।"

বাড়ির বাইরে যাবার হুকুম ছিল না। যদি কেউ কখনো বাইরে যাবার চেষ্টা করত, তৎক্ষণাৎ তাকে ভিতরে ফেরৎ পাঠানো হত। বড়রা বলতেন, "ভিতরে যাও, এখানে তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।" রবি ও তার বন্ধুদের তাতে কিছু এসে যেত না, কারণ বাড়ির ভিতরকার বাগান বাইরের এঁদোপুকুর ও কুঁড়ে ঘর থেকে ঢের বেশি সুন্দর ছিল।

সকালে জলখাবার হত বাসি লুচি আর ঝোলা গুড় দিয়ে। রবি এর থেকে ভাল খাবার বোধহয় কখনো খায়নি। বিরাট বিরাট ফলগাছের তলায়

একটা ছোট্ট পুকুর ছিল। ঘাট থেকে পুরনো ধাপ নেমে যেত জলের ভিতর পর্যন্ত। তারই উপর বসে খেলাধূলা আর আড্ডা হত। বাড়ির অন্যদিকে বয়ে যেত সুন্দর চওড়া গঙ্গা নদী। মাঝে মাঝে নৌকার সারি হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে তীর ঘেঁসে উজান বেয়ে যেত। রবির মনে হত এইখানেই তো সেই মুক্তি যাকে সে এতদিন খুঁজে এসেছে। তাকে খুঁজে বার করবার দরকার হয়নি, সে নিজেই এসে ধরা দিয়েছে।

চন্দননগরের বাগানবাড়ি



এমন সুন্দর দিনগুলিও একদিন ফুরিয়ে গেল। অসুখবিসুখ সেরে যাওয়াতে সকলে আবার যে যার স্কুলে যাওয়া শুরু করল। তবে রবি এখন বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতা কাকে বলে। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া, জোড়াসাঁকোর জীবনযাত্রা তার কাছে ভাল লাগতে শুরু করল। আবদুল্লা নামে এক জেলে মাঝে মাঝে দাদাদের জন্য ইলিশমাছ, কচ্ছপের ডিম ইত্যাদি এনে দিত। তার কাছ থেকে রবি বাঘের, কুমিরের আর সাংঘাতিক সব ঝড়ের গল্প শুনত। লোকটির মাথা নেড়া কিন্তু ছোট্ট একটি ছুঁচলো দাড়ি ছিল ; আর রবির কাল্পনিক অভিযানের সে ছিল এক নিত্য সঙ্গী।

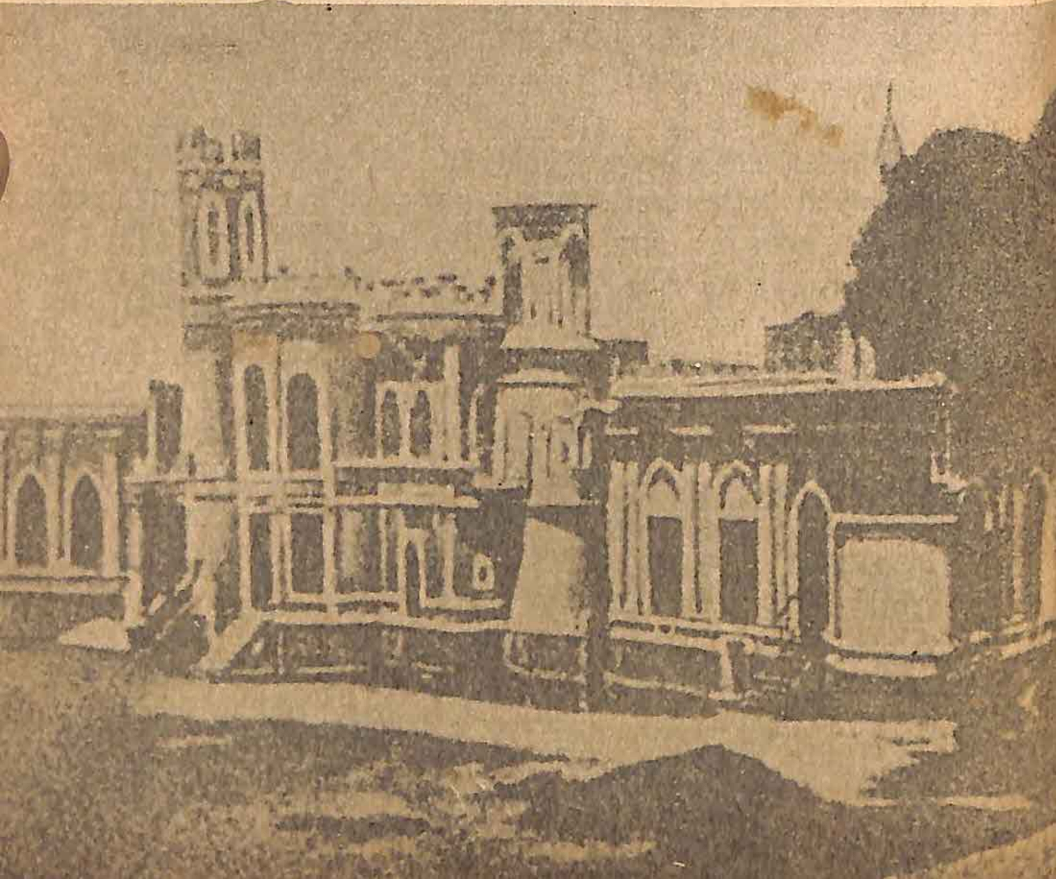
জোড়াসাঁকোর বাড়ির চারপাশের শহরটিও খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। রবি ছাদে উঠে তাকিয়ে দেখত চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে বাড়ির ছাদের ভিড়। সেখানে কেউ আচার শুকতে দিচ্ছে, কেউ বা কাপড় শুকতে এসেছে। মাথার উপর নীল আকাশ। রান্নার উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে উপর দিকে। কি শান্ত, ঘরোয়া পরিবেশ। এইসব দেখে সাধারণ মধ্যবিত্তরা কি করে জীবন কাটায় তা রবি শিখল।

ছুটির দিনে মাঝে মাঝে রবি লুকিয়ে বাবার ঘরে হানা দিত, কারণ হয়ত কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন, আপত্তি করবার কেউ ছিল না। সে প্রথমেই বাবার স্নানের ঘরে ঢুকে কল খুলে মনের আনন্দে স্নান করে নিত। কলকাতায় সেই সময় সবে জলের পাইপ বসানো শুরু হয়েছে আর ধারা স্নান বা "শাওয়ার" এর কথা খুব কম লোকেই শুনেছিল। স্নানের পর বাবার প্রিয় আরামকেদারায় বসে তাঁর বই পড়ত।

সন্ধ্যা বেলা আসত ফুলওয়ালী আর কুলপিওয়ালা। কাকাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা গানবাজনার আসর বসত। একবার রবি শুনতে পেল পাশের বাড়ি থেকে একজন মহিলা অতি করুণ সুরে কাঁদছে। পরে শুনে সে অবাক হল যে, সে তো মহিলা নয়, জামাইবাবু থিয়েটারে মহিলার পার্ট করছিলেন !

একটা ছোট্ট পুকুর ছিল। ঘাট থেকে পুরনো ধাপ নেমে যেত জলের ভিতর পর্যন্ত। তারই উপর বসে খেলাধূলা আর আড্ডা হত। বাড়ির অন্যদিকে বয়ে যেত সুন্দর চওড়া গঙ্গা নদী। মাঝে মাঝে নৌকার সারি হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে তীর ঘেঁসে উজান বেয়ে যেত। রবির মনে হত এইখানেই তো সেই মুক্তি যাকে সে এতদিন খুঁজে এসেছে। তাকে খুঁজে বার করবার দরকার হয়নি, সে নিজেই এসে ধরা দিয়েছে।

চন্দননগরের বাগানবাড়ি



এমন সুন্দর দিনগুলিও একদিন ফুরিয়ে গেল। অসুখবিসুখ সেরে যাওয়াতে সকলে আবার যে যার স্কুলে যাওয়া শুরু করল। তবে রবি এখন বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতা কাকে বলে। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া, জোড়াসাঁকোর জীবনযাত্রা তার কাছে ভাল লাগতে শুরু করল। আবদুল্লা নামে এক জেলে মাঝে মাঝে দাদাদের জন্য ইলিশমাছ, কচ্ছপের ডিম ইত্যাদি এনে দিত। তার কাছ থেকে রবি বাঘের, কুমিরের আর সাংঘাতিক সব ঝড়ের গল্প শুনত। লোকটির মাথা নেড়া কিন্তু ছোট্ট একটি ছুঁচলো দাড়ি ছিল ; আর রবির কাল্পনিক অভিযানের সে ছিল এক নিত্য সঙ্গী।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির চারপাশের শহরটিও খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। রবি ছাদে উঠে তাকিয়ে দেখত চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে বাড়ির ছাদের ভিড়। সেখানে কেউ আচার শুকতে দিচ্ছে, কেউ বা কাপড় শুকতে এসেছে। মাথার উপর নীল আকাশ। রান্নার উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে উপর দিকে। কি শান্ত, ঘরোয়া পরিবেশ। এইসব দেখে সাধারণ মধ্যবিত্তরা কি করে জীবন কাটায় তা রবি শিখল।

ছুটির দিনে মাঝে মাঝে রবি লুকিয়ে বাবার ঘরে হানা দিত, কারণ হয়ত কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন, আপত্তি করবার কেউ ছিল না। সে প্রথমেই বাবার স্নানের ঘরে ঢুকে কল খুলে মনের আনন্দে স্নান করে নিত। কলকাতায় সেই সময় সবে জলের পাইপ বসানো শুরু হয়েছে আর ধারা স্নান বা "শাওয়ার" এর কথা খুব কম লোকেই শুনেছিল। স্নানের পর বাবার প্রিয় আরামকেদারায় বসে তাঁর বই পড়ত।

সন্ধ্যা বেলা আসত ফুলওয়ালী আর কুলপিওয়ালা। কাকাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা গানবাজনার আসর বসত। একবার রবি শুনতে পেল পাশের বাড়ি থেকে একজন মহিলা অতি করুণ সুরে কাঁদছে। পরে শুনে সে অবাক হল যে, সে তো মহিলা নয়, জামাইবাবু থিয়েটারে মহিলার পার্ট করছিলেন !

বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রবিও গান শেখা শুরু করল। গান ভালবাসত বলে তার খুব সহজই লাগল। ভাইঝি প্রতিভা বিদেশী গান-বাজনা ভাল জানত, রবি তার কাছ থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখতে লাগল। দরজার আড়ালে সকলের অগোচরে দাঁড়িয়ে সে বহু ধর্ম ও উচ্চ সঙ্গীত একবার শুনেই শিখে ফেলল। রবির সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয়েছিল প্রথমে বিষ্ণু ওস্তাদের কাছে, তারপর তার শিক্ষা শুরু হল স্বনামধন্য যদুভট্টের



রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও গানের শিক্ষক শ্রীকাশীনাথ সিংহ

কাছে। কিন্তু অনেকদিন ধরে একটানা কিছু শেখা তার ধাতে সইত না।

যখনি কোন জিনিসে তার ক্লান্তি আসত, সে ছুটে ছাদে চলে গিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। কোথায় দূরে আকাশের গায়ে কালো দাগটি ক্রমশঃ একটি চিল হয়ে দেখা দিত। অস্তমান সূর্য দিগন্তে রঙের ছটা দিয়ে ডুবে যেত। দিন শেষ হবার কেমন একটা তোড়জোড় চলত, তার নিজস্ব আওয়াজটি কানে আসত, আর দেখা যেত হাঁসরা যেন শেষবার গা ঝাড়া দিয়ে পুকুর ছেড়ে নিজেদের বাসার দিকে চলেছে। শুধু রবিবার দিনটি বড় কষ্টকর মনে হত কারণ তার পরই সোমবারটি অন্ধকার কবরখানার মত যেন হাঁ করে অপেক্ষা করে থাকত।

ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েরা সিনেমা বা খেলাধূলার প্রতিযোগিতা দেখত না। তার প্রধান কারণ সেই সময় সিনেমা বলে কিছু ছিল না আর খেলাধূলার 'ম্যাচ' হত না। সুন্দর সুন্দর কাচের মার্বেল দিয়ে ওরা গুলি খেলত, লাট্টু ঘোরাত, ঘুড়ি ওড়াত। মাঝে মাঝে ভালুকওয়ালা আসত তার বুড়ো ভালুক নিয়ে, কয়েক পয়সার জন্য সে কেমন নাচত, ঘুমের ভান করে আবার দাঁড়িয়ে উঠে সারা শরীর কাঁপাত। সাপুড়ে আসত তার বাঁশীর সুরে কালকেউটের নাচ দেখাতে আর দূর থেকে শোনা যেত বেদে জাদুকরের মনমাতানো ঢোলকের আওয়াজ।

এ ছাড়া বাড়িতে নানান্ রকম উৎসব হত, তাতে সকলে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করত। সানাইওয়ালা আসত, উঠোনে শামিয়ানা তোলা হত। বহু নিমন্ত্রিত অতিথি আসত ; তাদের মনোরঞ্জনের জন্য খাওয়া-দাওয়া থিয়েটার, গান-বাজনার আয়োজন করা হত। বাড়িতে ধর্ম অনুষ্ঠানও হত প্রচুর— বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, মাঘোৎসব ইত্যাদি। শেষের ব্যাপারটির একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। রবির বাবা রাজা রামমোহন রায়ের অনুগামী ছিলেন, তিনি ঠাকুর পূজো বা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি

বিদেশী ধাঁচের শিক্ষা পছন্দ করতেন ও চাইতেন যে মেয়েরাও লেখাপড়া শেখে। তিনি সমাজ উন্নয়ন করতে চাইতেন। রবির বাবার বাড়ির ধর্ম অনুষ্ঠানগুলো বেদ ও উপনিষদের নিয়ম অনুসারে পালন করা হত। বন্ধুরা ও বাড়ির সদস্যরা মিলে কয়েকটি বিশেষ স্তবগান লিখেছিলেন এই উপলক্ষ্যে। দেবেন্দ্রনাথ নিজে উপনিষদ থেকে বিশেষ বিশেষ পাঠ ও বাণী বেছে নিয়েছিলেন। বাড়ির ছেলে-যুবকদের নির্ভুল সংস্কৃত বলা ও লেখা শেখানো হয়েছিল। উপনয়নের পর রবিও সংস্কৃত শিখেছিল আর চিরদিনের জন্য ঐ ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল।

ই সব উৎসবের দিনে ছোটদের স্বাধীনতা আরেকটুকু বেড়ে যেত। তারা মুগ্ধদৃষ্টিতে সাজ-সরঞ্জাম, আয়োজন দেখতো। রবির চোখ নিবদ্ধ থাকত মাটিতে শামিয়ানার জন্য বাঁশ পোঁতার গর্তগুলোর দিকে, যদি খুঁড়তে গিয়ে কোনো গুপ্তধন পাওয়া যায় !! কিন্তু সব সময় তাকে নিরাশ হতে হত।

পাঁচ

রবির বারো বছর বয়সে বাবা স্থির করলেন সোমেন্দ্র ও সত্যর সঙ্গে তারও পৈতা দেওয়া হবে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পর্যটন থেকে ফিরে এসে বন্দোবস্ত শুরু করলেন। তিনি চাইতেন সব আয়োজন পরিপাটি ও সর্বাঙ্গসুন্দর হোক। কিন্তু নজর রাখতেন যাতে পৌত্তলিকতার রেশ মাত্র না থাকে।

রবিকে গেরুয়া কাপড় পরে, মাথা কামিয়ে একটি ঘরে বসে থাকতে হয়েছিল। তাকে হবিষ্যি খেতে ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয়েছিল। এ সব তার ভালই লাগল। তিনজনে মিলে নানা রকম দুষ্টুমি শুরু করল। রবির শুধু এক ভাবনা ছিল, নেড়া মাথা নিয়ে কি করে স্কুলে যাবে?

উপনয়নের পালা শেষ হতে না হতে বাবা তাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কয়েকমাসের জন্য তুমি আমার সঙ্গে ঘুরে আসতে চাও, রবি?"

রবি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। এ প্রশ্নের শুধু একটাই উত্তর হতে পারে।

বাবা বললেন, "পথে কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে থাকব।" রবির আনন্দের পেয়ালা উপচে উঠল; জীবনে প্রথম ট্রেনে চড়া, শান্তিনিকেতন ও

আশপাশের ধানক্ষেত দেখা, আর সত্যর কাছে শোনা সেই আশ্চর্য রাস্তা নিজের চোখে দেখা !

দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে গেল। জীবনে প্রথম তার বড়দের মতো নতুন পোষাক হল, নতুন একজোড়া ভাল জুতোও এল। কিন্তু সুখ সব সময় সম্পূর্ণ হয় না ; জামাকাপড়ের সঙ্গে একটা গোল ভেলভেটের টুপিও এল, তাতে আবার সোনালী ফুল তোলা ! বাইরে যেতে হলে এটি তাকে মাথায় দিতে হবে। সে টুপিটাকে হাতে করে নেবার ফন্দি করল।

রবীন্দ্রনাথের বাবার তৈরী প্রথম ইঁটের বাড়ি।



ট্রেনের কামরায় সে তার পাশে সিটের উপর সেটাকে রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটি হবার জো নেই। বাবা বললেন, "তোমার টুপিটা কোথায়? মাথায় দিয়ে থাক।"

যখনই সে খুলে ফেলে তখনই ঐ এক কথা! রবি শেষ পর্যন্ত টুপিটাকে ছুচোখে দেখতে পারত না!

ট্রেনে যাত্রা মোটেই সেরকম ভয়াবহ নয়, যেমন সত্য বুঝিয়েছিল। তারা বেশ অনায়াসে ট্রেন থেকে ওঠানামা করতে পারল। বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনে পাল্‌কি চড়ে যেতে হল।

শান্তিনিকেতনে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। রবি সারা রাস্তা চোখ বুজে রইল, কারণ তার ইচ্ছা ছিল সে প্রথম শান্তিনিকেতন দেখবে ভোরবেলার পরিষ্কার নতুন আলোয়। হয়েছিলও তাই! সে যখন সত্যি সত্যি চোখ মেলল তখন শান্তিনিকেতন ভোরবেলার আলোয় ঝলমল করছে।

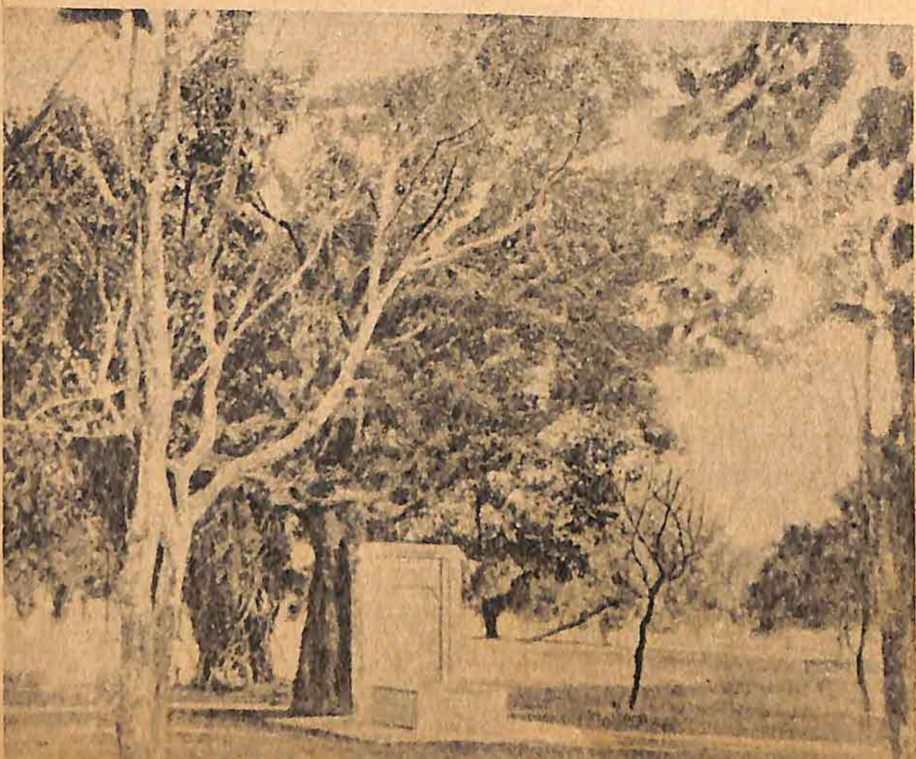
রবি তৎক্ষণাৎ সত্যর সেই মায়াপুরীর রাস্তা খুঁজে বের করবার জন্য লেগে গেল। তাছাড়া খোঁজ করতে লাগল সেই ধানক্ষেত যার ধারে গাছের তলায় বসে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে চড়ুইভাতি করা যায়। এ সব কিছুই খুঁজে পেল না বটে, কিন্তু তার বদলে আরো অনেক সুন্দর জিনিস তার চোখে পড়ল। দূর অবধি উবড়ো-খেবড়ো খোয়াই চোখে পড়ল, তারপর একটি ঘন নীল রেখার মতো দিগন্ত। মাথার উপর উন্মুক্ত নীল আকাশ, ঝলমলে রোদ, ঝিরঝিরে হাওয়া আর পাখির গান।

সে একা খোয়াইয়ে বেড়াতে গেল। অসমতল শুকনো লাল মাটি। শুধু এখানে ওখানে বেঁটে খেজুর ও কাঁটাগাছ গজিয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে লালমাটি ধুয়ে গিয়ে নালা, পাহাড়, টিলায় পরিণত হয়েছে। বৃষ্টির জলে

ভরা ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে তার মধ্যে দিয়ে। কয়েকটা ঝর্ণা ও ছোট্ট পুকুরও চোখে পড়ল, তাতে আবার কচি কচি জ্যান্ত মাছ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে! মাটি থেকে নুড়ি পাথর কুড়তে কুড়তে রবির মন আনন্দে ভরে গেল।

তার সব থেকে আনন্দের জিনিস হল সেই মহাপুরুষটির অর্থাৎ বাবার সঙ্গ। সে বুঝতে পারল বাবা মোটেই ভয় পাবার জিনিস নন্, বরঞ্চ আদরের, ভালবাসার জিনিস।

ছাতিম তলা। এখানে রবীন্দ্রনাথের বাবা ধ্যান করতেন।



একদিন সে মুঠো ভর্তি নুড়ি পাথর এনে বাবাকে উপহার দিয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার জন্য আরো এনে দিই?" বাবা বললেন, "হ্যাঁ, আরো কিছু এনে ঐ ছোট্ট পাহাড়টি সাজাও। ওখানে বসে আমি উপাসনা করি।" সেই পাহাড়টি এখনো আছে, কিন্তু নুড়ি-পাথরগুলো কবে হারিয়ে গিয়েছে।

রবি বলেছিল, "আমরা খোয়াইয়ের পরিষ্কার পুকুর থেকে কেন খাবার জল আনি না?" তাই শুনে বাবা মোটেই হাসেন নি বরং হুকুম দিয়েছিলেন খোয়াই থেকে জল আনা হোক।

বাবা রবিকে ছোট ছোট কাজের ভার দিতেন। বাবার সোনার ঘড়ির দম দিতে হত। খুচরো পয়সা রাখার দায়িত্ব রবির উপর ছিল; তার থেকে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে হত, খুঁটিনাটি জিনিস কিনতে হত, তার হিসাবও রাখতে হত। একবার ঘড়িতে একটু বেশি দম পড়ে যাওয়াতে সেটাকে আবার মেরামত করতে পাঠানো হল। আরেকদিন ক্যাশবাক্সে দুটি পয়সা বেশি দেখে বাবা হেসে বললেন, "রবির হাতে থাকলে পয়সা যখন বেড়ে যায়, তাহলে বড় হলে জমিদারির হিসেব ও-ই রাখবে।"

কিছুদিন পর তারা অমৃতসর গেল, অবিশ্যি রাস্তায় আরো অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে। দলে শুধু তিনজন প্রাণী—বাবা, রবি আর কিশোরীবাবু যার উপর জিনিসপত্র দেখাশোনার ভার ছিল। সেই প্রথম শান্তিনিকেতন দেখার স্মৃতি চিরকাল রবির মনে একটি বিশেষ কোণ বেছে নিয়েছিল। সেই প্রথমদিন থেকেই রবি জায়গাটাকে ভালবেসেছিল, পরে তার প্রায় সারা জীবন সেখানেই কেটেছিল।

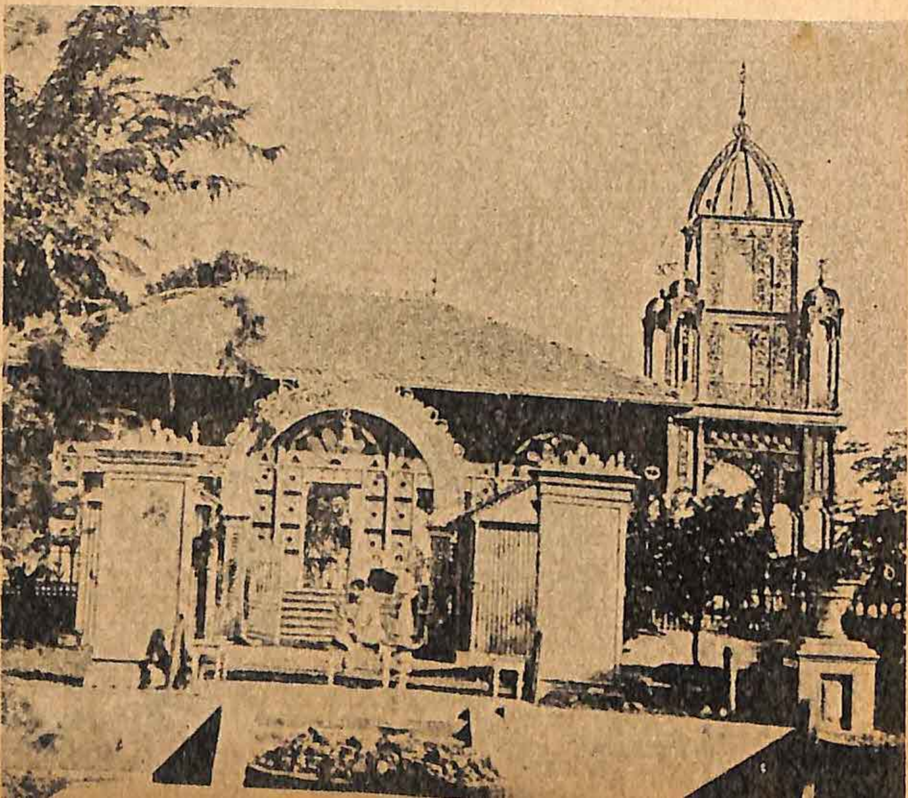
শান্তিনিকেতন কবিতা লেখার পক্ষে যে উপযুক্ত জায়গা, রবি তা আবিষ্কার করেছিল। বাগানে একটা কচি নারকোল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে, সামনে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে সে কবিতা লেখা শুরু করল। সেই





নীলরঙের খাতাটা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হওয়াতে ফেলে দিতে হয়েছিল। রবির এখন নতুন বাঁধানো মলাটের খাতা হল। এই খাতায় রবি লিখেছিল বীররসে ভরা কবিতা "পৃথিরাজের পতন"। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ খাতাটি বহুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছে।

শান্তিনিকেতনের কাঁচের মন্দির। রবীন্দ্রনাথের বাবা তৈরী করেছিলেন



ছয়

বয়সের অনুপাতে রবি লম্বা ও স্বাস্থ্যবান ছিল। কিন্তু তার বয়স বারো বছরের কম হওয়াতে, বাবা তার জন্য রেলের হাফ টিকিট কিনলেন। ট্রেনের টিকিট চেকারবাবু তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই ছেলেটির বয়স কি সত্যই বারো বছরের কম ?"

বাবা বললেন "নিশ্চয়"।

"আপনি ঠিক জানেন ? আমার তো বড় মনে হচ্ছে ?"

ছল চাতুরি সন্দেহ করলে সব সৎলোকেরাই চটে যান, বাবাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরো টিকিট কিনে আনালেন এবং বাকি খুচরো পয়সা ছুঁড়ে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে পয়সার কোনো মূল্য নেই। টিকিট-চেকার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। কিন্তু বাবার প্রতি রবির শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেল, এত ধীর শান্ত লোক দরকার হলে যে এত রাগ করতে পারে তা সে ভাবতেই পারেনি।

অমৃতসরে তারা দরবার-সাহেবে রইল। প্রায় রোজ সকালবেলা রবি সেই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরে যেত। সেখানে জলের ধারে দাঁড়িয়ে মন্দিরের ভিতরের উপাসনা ও স্তবগান শুনত। তার বাবাও সেই উপাসনা ও গানে যোগ দিতেন। শিখভক্তেরা অতি সদাশয় ও সহৃদয় ছিল। রবি হালওয়া ও মিছরি প্রসাদ নিয়ে ফিরে আসত।

মাঝে মাঝে বাবা বলতেন "জোড়াসাঁকোতে তোমরা যে সব স্তবগান

শিখেছিলে তা গেয়ে শোনাও।" রবি তার মিষ্টি গলায় গাইত আর বাবা চোখ বন্ধ করে, হাত জোড় করে শুনতেন।

অমৃতসরে তারা একমাস ছিল। রবি কিন্তু তখনো লেখাপড়া থেকে নিস্তার পায়নি। সঙ্গে অনেক পড়ার বই এসেছিল। বাবার তদারকে সে ইংরিজি, বাঙলা, ব্যাকরণ, সংস্কৃত ও জ্যোতির্বিদ্যা শিখত। এসব সত্ত্বেও তার চারিদিকে তাকিয়ে দেখবার, বুঝবার অনেক সময় থাকত। রবির মন আরো দৃঢ় ও পরিণত হল। নিজেই উপলব্ধি করতে পারল যে সে বড় হয়ে গেছে।

তারপর অমৃতসর থেকে তারা গেল ডালহৌসী পাহাড়ে। রবির এই প্রথম পাহাড় দেখা। ভোরবেলা দুধ-রুটি খেয়েই পাহাড় চড়া শুরু হল। তবে পায়ে হেঁটে উঠতে হল না, 'ঝাঁপানে' চড়ে গেল। রবি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ধানক্ষেত নিচে রেখে তারা কত উপরে উঠে যাচ্ছে যেখানে গাছের আকৃতি বিশাল ও ঘন হয়ে এসেছে। ঝর্ণার আওয়াজ কানে আসতে লাগল, তারপর দেখতে পেল ছোট ছোট নদী কেমন করে পাহাড়ের গা বেয়ে দৌড়ে নেমে আসছে।

সে রাত্রে তারা এক ডাক-বাঙলায় রইল। বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে বাবা তাকে একে একে তারার ও গ্রহের নাম চেনাতে লাগলেন। সারা আকাশ তারায় ভরা। তার নিচে পাহাড়ের মাথাগুলো অবাস্তব দেখাচ্ছিল, মেঘ ও কুয়াশায় কেমন একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

ভোরবেলা আলো হবার আগেই বাবা উঠে উপাসনা করতেন। তারপর বাবা ও রবি হাঁটতে বেরোতেন। ফিরে এসে বাবার কাছে রবি ইংরিজি পড়ত। রবি ভাষা ভালবাসত তাই খুব তাড়াতাড়ি ইংরিজি, বাঙলা, সংস্কৃত ও মৈথিলী ভাষা শিখে নিয়েছিল। যা হাতের কাছে পেত তাই সে পড়ে ফেলত, এমন কি যেগুল্যো ভাল করে বুঝতে পারত না, সেগুলো পর্যন্ত। শব্দের আওয়াজ তার ভাল লাগত, যেগুলোর অর্থ বুঝত না তাও ভাল লাগত।

সাদাসিধা খাবার রবির ভাল লাগত কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দুধ খাওয়াটা রবির একেবারেই পছন্দ ছিল না। দুপুরের খাবার পর তার আবার পড়তে বসার কথা, কিন্তু ঘুমে চোখ ভরে আসত বলে বাবা তাকে ছেড়ে দিতেন। সে কিন্তু না ঘুমিয়ে লোহা বাধানো ছড়িটি হাতে নিয়ে একা বহুদূর অবধি ঘুরে আসত। এতে বাবা কখনো বকতেন না। কারণ তিনি চাইতেন ছেলেরা স্বাবলম্বী হোক, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখুক।

রবি বাবাকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি সম্বন্ধে অনেক কথা বলত যা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন, কারণ এর আগে তাঁকে এসব কথা কেউ বলেনি, সবাই তাঁকে বড় বেশি সমীহ করে চলত। বাড়ির চিঠি দুজনে এক সঙ্গে পড়তেন ও তাই নিয়ে আলোচনা করতেন। বাবা তাকে অনেক হাসি-ঠাট্টার গল্প বলতেন। রবি অত বড় লোকটির এত ঘন সান্নিধ্যে কখনো আসতে পা.রনি, আর এত ভাল করে কোনদিনও চিনতে পারেনি।

কয়েক মাস পরে রবি কিশোরীবাবুর সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এল আর বাবা একা তাঁর ভ্রমণ শেষ করতে লাগলেন।

ঐ কয়েকমাসে রবির অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সে অনেকখানি সাবালক হয়েছিল। সকলে তাকে আরো সম্মান দিতে লাগল। সে আর একটা সামান্য, তুচ্ছ ছোট ছেলে রইল না।

বাড়ির সকলে তার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। প্রথম কয়েকদিন সে মহা আনন্দে এঘর ওঘর ঘুরে,সকলকে নিজের ভ্রমণ কাহিনী শুনিয়ে বেড়ালো। তার মায়ের গর্বের সীমা রইল না। ভিতরের বারান্দায় গোল হয়ে বসে অবাক হয়ে বাড়ির মেয়েরা রবির কাছে আশ্চর্য সব গল্প শুনতে লাগলেন।

রবি তার নব অর্জিত জ্ঞান দেখাতে লাগল। সে গ্রহ-তারার বিষয় বলল, বাবা যেমন করে পড়তে শিখিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবে উপনিষদ থেকে কয়েক লাইন মুখস্থ বলল। সকলে তাকে ন্যায্য সম্মান থেকে বরং একটু বেশিই দিল আর সত্যি কথা বলতে কি এতে রবির খানিকটা অহঙ্কারও

হল। মা আহ্লাদে ভরপুর হয়ে সকলকে ডেকে আনলেন, রবির মুখে সংস্কৃততে রামায়ণ শুনবার জন্য। রবির নিজের একটু অস্বস্তি মনে হচ্ছিল, কারণ যা শিখেছিল তার সবটা ঠিক তার মনে ছিল না!

স্কুলে ফিরে যাওয়াটা তার পক্ষে একটা পরম শাস্তি হল। সৌভাগ্যের বিষয় পুরনো স্কুলে আর যেতে হল না। তার থেকে অনেক ভাল নামকরা স্কুল—সেণ্ট জেভিয়ার্স। কিন্তু সেখানে গিয়েও তার ভাল লাগল না।

রবি আরো কবিতা লিখতে লাগল, তবে সেগুলো আর ছেলেমানুষী কবিতা নয়। 'অভিলাষ' বলে একটা কবিতা লিখল। এই কবিতাটি বড়দের একটা পত্রিকায় ছাপানো হল। এবার সত্যি সত্যি তার শৈশবের সেই ভাবনা চিন্তাহীন দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। বাড়িতে এক গভীর শোকের ছায়া পড়ল। রবির মা কয়েকদিনের অসুখে মারা গেলেন। রবির বয়স তখন তেরো বছর দশ মাস। তার মায়ের বয়স পঞ্চাশও হয়নি।

তিনি রাত্রিবেলা গেলেন আর সকালবেলা ছোটদের ডেকে পাঠানো হল ফুলে ঢাকা সেই অপরূপ মূর্তিকে শেষবারের মত দেখবার জন্য। অত্যন্ত দুঃখের সময় সন্দেহ নেই, কিন্তু মায়ের কাছ-ছাড়া থাকা রবির অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তার দাদাদিদিবৌদিরা তাকে আদরে বুকে টেনে নিয়ে দুঃখ ভোলাবার চেষ্টা করলেন। বাবা ক্রমশঃ সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে উপাসনা ও ধ্যানে সময় কাটাতে লাগলেন।

রবির স্মৃতিতে তার মা হয়ে রইলেন একজন শান্ত প্রকৃতির কোমল স্বভাবা মানুষ যিনি সর্বদা তার কবিতার আগ্রহী শ্রোতা ছিলেন। যখন অন্যান্য সকলে পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার জন্য রবিকে শাসন করত, তখনো তাঁর ছোটছেলের গুণের জন্য মায়ের বুক গর্বে ভরে যেত।

সাত

রবির জীবনে এবার এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। তার বয়স এখন চৌদ্দ, সে আর শিশুটি নয়, যদিও এখনো তার বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পূর্ণ হয়নি, হওয়াও শেষ হয়নি। এখন সে সফলতার সঙ্গে স্কুল ফাঁকি দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু বাড়িতে তার মাস্টার আসতেন আর হাতের কাছে যে কোনো বই, পত্রিকা বা কাগজ পেত তাই সে পড়ে ফেলত। এইভাবে সে অনেক কিছু শিখে ফেলেছিল। সংস্কৃত ও বাঙলায় লেখা বহু পুরনো বই ও পাণ্ডুলিপি তার পড়া ছিল। সে মৈথিলী ভাষা শিখে অনেক প্রাচীন কবিতার রসভোগ করতে পারত। মৈথিলী হল আধুনিক বাঙলা ভাষার থেকেও প্রাচীন ও এই দুইটি ভাষায় বেশ পার্থক্য রয়েছে। রবি কিন্তু ভাষাটি বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

রবি তার নিজের অন্তরের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল যদিও পরে নিজের বিষয় লিখেছিল, "আমি শুধু গরম হাওয়া ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারিনি। সেই সময় যে সব কবিতা লিখেছিলাম তার কোনো মূল্য নেই।" তার বয়স তখন কাঁচা ছিল।

রবির চারিপাশে গুণীলোকের সমাগম হত। রবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নামকরা দার্শনিক ছিলেন। তাছাড়া তিনি সুন্দর গম্ভীর কবিতাও লিখতে পারতেন। অনেকে তাঁর কবিতা উপলব্ধি করতে পারত না আর যখন তিনি পড়ে শোনাতে চাইতেন তখন কোনো না কোনো ছুতো করে সেখান থেকে

চলে যাবার চেষ্টা করত। তাই তিনি নিজের চাকরকে ডেকে কবিতা পড়ে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "এবার বল, কেমন লাগল ?" সে বেচারা মাথা নেড়ে যেত, তবে মাঝে মাঝে বলে ফেলত, "না, না, এবার অতটা ভাল হয়নি।"

রবি ছিল সব থেকে ছোট ভাই। সে দাদাকে খুব শ্রদ্ধা করত, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছিল বড়দাদার কবিতা নকল করা তার সাধ্যের বাইরে। তাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি রীতি খুঁজে বার করতে হয়েছিল।

সারা বাড়িটা উত্তেজনায় গমগম করত। সেটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়, যা কিছু দেশী তা ফিরিয়ে আনতে হবে, এই নিয়ে সকলে ব্যস্ত ছিল। তখন দুটি দল ছিল। প্রথম দল বলত, যা কিছু প্রাচীন তা মন্দ, অকেজো। পাশ্চাত্য দেশকে সব বিষয়ে নকল করে আমাদের শিখতে হবে। অন্য দলটি বলত, যা কিছু বিদেশী তা বর্জন করতে হবে আর যে করেই হোক না কেন আমাদের নিজেদের প্রাচীন প্রথা রক্ষা করতে হবে।

এবার একটি তৃতীয় দল এগিয়ে এল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন এই দুই দলের সংমিশ্রণে। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি, রীতি-নীতি বজায় রেখে দেশ ও দশের উন্নয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের উপযুক্ত প্রথা প্রণালীকেও আয়ত্ত করে নিতে হবে। রাজা রামমোহন রায়, ঠাকুররা ও আরো অনেকে এই দলভুক্ত ছিলেন। রবি এদের প্রভাবে এসে স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এরা গুপ্ত সভা করতেন, স্বদেশী গান ও নাটিকা লেখা হত ও একটি স্বদেশী থিয়েটার খোলা হল। যে-সব স্বদেশী ব্যবসায়ী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েছে তাদের তাঁরা সাহায্য করতেন। স্বদেশী দোকান খোলা হোল ও সকলে দেশে তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করতে শুরু করলেন। রবি এই সুযোগে বহু নামকরা স্বদেশভক্তদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পেরেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ আরেক ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা তাদের ইংরাজ শাসনকর্তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রথম ভারতীয় সদস্য। তার স্ত্রী ছিলেন সেই প্রথম ভারতীয় মহিলাদের একজন যাঁরা বনেদী বংশের মেয়ে হয়েও পর্দার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর সুন্দর বই লিখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে এসে ভাড়া বাড়িতে নিজের পরিবার নিয়ে থাকতেন। রবি সে বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করত আর তাঁদের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করা শিখেছিল।

তখন কলকাতায় প্রত্যেক বছর স্বদেশী মেলা হত। তাকে হিন্দুমেলা বলা হত। সেখানে দিশী শিল্প ও জিনিসপত্র প্রদর্শন করা হত আর দেশী গান-বাজনা, নাটিকার আসর বসত। দেশাত্ববোধক বক্তৃতা দেওয়া হত ও গান গাওয়া হত। এই রকম একটি মেলায় রবি পনেরো বছর বয়সে জনসাধারণের সামনে প্রথমবার এসে দাঁড়িয়ে তার লেখা একটি দেশাত্মবোধক কবিতা হিন্দুমেলায় সকলের সামনে পড়ে শোনাল।

শত শত লোক তার মুখে কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। অবশ্য, তখন লোকে তার নামও জানত না। পরে একটি পত্রিকায় ঐ কবিতাটি ছাপা হয়েছিল কিন্তু তখনও নাম প্রকাশ করা হয়নি। রবি এবার বুঝতে পারল যে স্বদেশবাসীদের সে-ও কিছু দিতে পারে। রবির একজন কড়া সমালোচক ছিলেন। তিনি দাদা জ্যোতিরিন্দ্রের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। রবির থেকে তিনি কিছু বড় ছিলেন ও অনেক বই, পত্রিকা ইত্যাদি পড়তেন। তাঁর আদর্শ ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং যদিও তিনি রবিকে নানান ভাবে উৎসাহ দিতেন, তাকে স্পষ্ট বলেও দিয়েছিলেন যে বিহারীবাবু এবং সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো কবিতা সে কোন দিনও লিখতে পারবে না। রবি তা শুনে খুব মর্মাহত হয়েছিল এবং দৃঢ় মনোস্থির করেছিল যে সে খুব ভাল কবিতা লিখবার চেষ্টা করবে।

সত্যি, এই বৌদি রবির খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন আর নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাঁরই জন্যে বিহারীলাল ও অন্যান্য কবিদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিল। তিনি যদি রবির একজন পথ প্রদর্শক না হতেন, তাহলে রবি জীবনে সত্যি খুব সঙ্গীহীন হয়ে পড়ত। তার মা মারা গিয়েছেন, বাবাও আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকেন না। জ্যোতিরিন্দ্র আগের মতোই জোড়াসাঁকোর বাড়ির উপর তলায় থাকতেন। সামনে একটি খোলা ছাদ ছিল যেখানে কাদম্বরী দেবী ফুলের ও পাতাবাহারের গাছ টবে লাগিয়ে ছিলেন। সেখানে সন্ধ্যেবেলা অনেকে এসে বসতেন, নানা রকমের সমালোচনা হত—বই, গান-বাজনা, রাজনীতি। গানের আসরে রবির মিষ্টি গলার স্বর ও সুরেলা কান তাকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

বহুলোকে জোড়াসাঁকোতে আসতেন কিন্তু মহিলারা সবসময় অনুপস্থিত থাকতেন। বাড়ির মেয়েরাও বড় একটা বাইরে আসতেন না। এবার এক নতুন যুগের শুরু হল। দ্বিজেন্দ্রনাথের মেয়ে বেথুন স্কুলে ভর্তি হল। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা ইংলণ্ডে গেলেন। ঠাকুরবাড়ির আরো কয়েকজন পুরনারী পর্দা ঠেলে বাইরে এলেন, এমন কি ঘোড়াতেও চড়লেন !

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি পিয়ানো কিনে তাতে বিলিতি সুর বাজাতে লাগলেন। এইসব নতুন সুর রবির কানে অভ্যস্থ হয়ে গেলেই, রবি তাতে কথা দিতে আরম্ভ করল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ত মহাখুশী ! দুজনে মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান-বাজনায় ডুবে থাকতেন। এতে রবির উৎসাহ আরো দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

দাদার লেখা নাটিকার জন্য গানের কথা ও সুর লিখে দিয়েছিল রবি। সেটি আবার কাকার বাড়িতে মঞ্চস্থও করা হয়েছিল। সকলে রবির খুব প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের ইচ্ছা ছিল রবি ভালভাবে পাশ করে একটা উপযুক্ত চাকরি নেয়। তাঁরা বললেন, "রবির এখন

পনেরো বছর বয়স, এবার তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য গড়ে ওঠা উচিত।" শুধু কবিতা, গান, উপন্যাস রচনা করা যথেষ্ট নয়।

আসলে রবি যথেষ্ট লেখাপড়া করত, তবে চিরাচরিত প্রথায় নয়, স্কুলে মাস্টারদের কাছে নয়। সে একটি মৈথিলী কবিতাগুচ্ছ সংগ্রহ করে এনে সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে ফেলল। তারপর এক বর্ষার দুপুরে, খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে, স্লেটে ঐ পুরনো মৈথিলী কবিতার অনুকরণে কয়েক লাইন কবিতা লিখল এবং নিজের প্রচেষ্টায় নিজেই খুব খুশী হয়ে উঠল।

কিছুদিন পর। সে একজন পুরনো বন্ধুকে ধরে বলল, "জান, ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীর।পুরনো বই ঘাঁটতে গিয়ে ভানুসিংহ বলে এক মৈথিলী কবির পোকায়।কাটা পুঁথি পেলাম। এই দেখ, আমি তার কয়েকটা কবিতা তুলে এনেছি।" এই বলে রবি কবিতাগুলো পড়ে শোনাল। তার বন্ধু ত অবাক! "আরে এত চমৎকার হয়েছে এগুলো বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখার থেকেও ভাল। আমাকে এগুলো দাও। অক্ষয়বাবু খুশী হয়ে তাঁর পুরনো কবিতার মতুন সংকলনে ছাপিয়ে দেবেন।"

রবি তাই শুনে খুব লজ্জা পেয়ে বলল, "আসলে ওগুলো আমারই লেখা। এই দেখ তার খসড়াগুলো।" এই হল ঐ কবিতাগুলির অবিশ্বাস্য সত্য। কবিতাগুলো 'ভারতী' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় ভানুসিংহের নামে ছাপানো হল। সকলে পড়ে প্রাচীন কবি ভানুসিংহের বিষয় নানা রকম অতিরঞ্জিত প্রশংসা করতে লাগলেন। শুধু বাড়ির লোকেরা ও কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জানতেন যে কবিতাগুলো একজন পনেরো বছরের ছেলের লেখা, নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আসলে 'ভারতী' ছিল একটি পারিবারিক পত্রিকা; প্রকাশক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ। রবি এই পত্রিকার জন্য নিয়মিত কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে যেত। এই পত্রিকায় তার বড় কবিতা "কবি-কাহিনী" বেরিয়েছিল,

পরে সেটা একটি ছোট বই হয়েও বেরোল। এইটিই রবির প্রথম বই। রবি বড় হয়ে পরে এই কবিতা ও প্রবন্ধগুলিকে নিছক শিশুসুলভ ও উদ্দেশ্যহীন বলে নিন্দা করেছিল।

এইভাবে বাড়ির লোকে যখন রবির ঐরকম ছন্নছাড়া জীবনের জন্য হাহুতাশ করছিলেন, তখনি রবি নিজে নিজের ভবিষ্যতের রাস্তা বেছে নিচ্ছিল। সে লিখতে পারে। তার ভিতরে এমন একটা প্রেরণা আসত, যাকে মেনে নিতেই হত। তাছাড়া তার নিজস্ব একটি স্কুল স্থাপন করবার জন্যও সে ব্যস্ত হয়েছিল—কিন্তু সেই বাসনাটি সফল হতে আরো অনেক বছর সময় লেগেছিল।

আট

রবিকে সাবালক করে তুলবার জন্য সব দাদাদিদিরা সাহায্য করেছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর বড়দিদি সৌদামিনী দেবী সেই স্থান পূর্ণ করেছিলেন। তিনি বাবার ও সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আরেক দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যিকা ছিলেন। তিনি কবিতা ও গল্প লিখতেন, পরে 'বালক' নামে একটি ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। রবি এই পত্রিকাতেও লিখত। ক্রমশঃ তার নিজের উপর আস্থা হতে লাগল।

সব ভাইবোনদের মধ্যে অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রই তাকে সব থেকে প্রভাবিত করেছিলেন। বয়সে বারো বছরের বড় হলেও রবিকে তিনি সব থেকে ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রবির গান-বাজনার অনুরাগকে প্রচুর উৎসাহ দিতেন ও মাঝে মাঝে তার লেখা গান তাঁর নাটক ইত্যাদিতে ব্যবহার করতেন। অনেক বিষয়ে তিনি রবির মতামত জানতে চাইতেন আর রবিও দাদাকে সাহায্য করতে পারলে আর কিছু চাইত না।

গান-বাজনার উপর অনুরাগ ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাইরের খেলাধুলা ভালবাসতেন। যেমন, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মাছ ধরা। এই সব ব্যাপারে তিনি সর্বদা রবিকে সঙ্গী নিতেন, কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন যে রবির কাছে খোলা আকাশ, বাতাস, অবাধ স্বাধীনতা কতখানি প্রিয়। রবি কিন্তু শিকার সহ্য করতে পারত না। খাঁচায় শিকল-বন্দী পশু-পাখিকে দেখেও তার মন দুঃখে ভরে যেত। সে একবার একজোড়া কাঠবেড়ালীকে

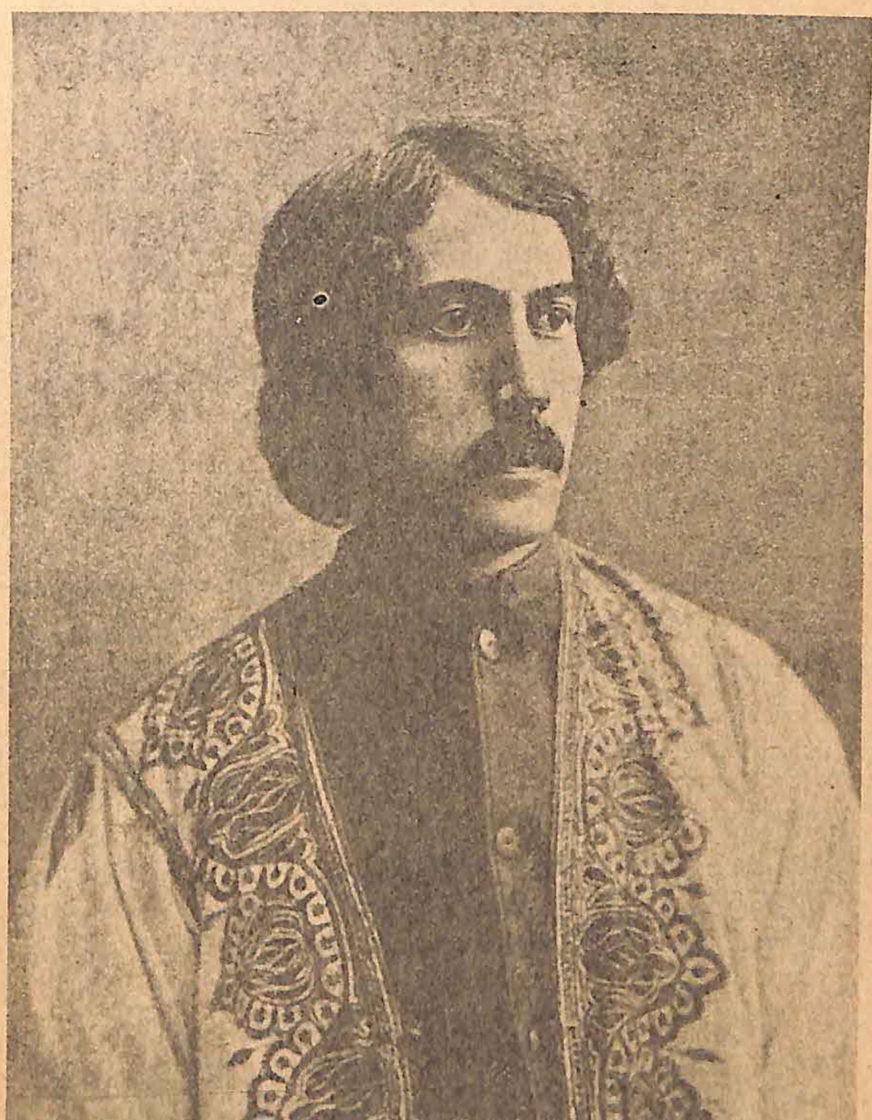
খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়েছিল, তাতে কাদম্বরী দেবী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ তিনি বহু যত্নে তাদের পোষ মানাতে শেখাচ্ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁদের পূর্ববঙ্গের জমিদারী পর্যবেক্ষণ করতে যেতেন। একবার তিনি রবিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাঁরা গোরাই নদীর ধারে শিলাইদহের বাড়িতে রইলেন। জায়গাটা পদ্মানদীর সঙ্গম থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এক সময় এই সব জমি নীলকর সাহেবদের ছিল। একটি ভাঙ্গা নীলের কারখানা তখন পর্যন্ত ছিল। সাহেবদের পোঁতা লম্বা লম্বা দেবদারুগাছ বাতাস বইলে সোঁ সোঁ আওয়াজ করত।

গ্রামের লোকেরা বলত জায়গাটা ভূতুড়ে, তাতে রবি আরো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। মস্ত বড় খোলা ছাদের পাশে রবির ছোট্ট ঘরটি ছিল। আর ছিল অগাধ অবসর। রবির খাতা কবিতায় ভরে গেল। সে জ্যোতিদাদার কাছে গিয়ে বলল, "বাগানের ফুল থেকে রস নিঙড়িয়ে আমার কবিতা লেখার জন্য রঙিন কালি তৈরি করতে পারি?" তিনি বললেন, "অবশ্য। আরো কিছু দরকার হলে আমাকে বলবে।" তিনি রবির জন্য একটি ঘোড়া ভাড়া করলেন। সেটি আবার খুব শান্ত প্রকৃতির ছিল না। রবি সারা গ্রামাঞ্চল ঘুরে বেড়াত ঐ ঘোড়ার পিঠ জাপটে ধরে, যাতে কিছুতেই না পড়ে যায়। পরে স্মৃতি কথায় লিখেছিল, "আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাইনি কারণ জ্যোতিদাদার বিশ্বাস ছিল যে আমি পড়ব না।"

একদিন বিশ্বনাথ শিকারী এসে খবর দিল, "হুজুর, শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ বেরিয়েছে।" মুহূর্তের মধ্যে জ্যোতিদাদা বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে রবিকে বললেন, "চল রবি, বাঘটাকে মেরে আসি।" তাই শুনে রবির ফুর্তি দেখে কে!

গভীর জঙ্গল। শিকারীদের গাছে বসবার জন্য কোন মাচান তৈরি নেই বিশ্বনাথ মনে করত পুরুষদের বাঘের সঙ্গে সামনাসামনি লড়া উচিত। কিন্তু



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোটা মোটা বাঁশগাছে খাঁজ কাটা হয়েছিল যাতে তাই বেয়ে উপরে উঠে চারিদিক নিরীক্ষণ করা যায়। রবির খালি পা থাকাতে সে চটপট উঠে গেল।

ঝোপের মধ্যে হলদে গায়ে ডোরা কাটা কি একটা দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দুক ছুঁড়লেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাঘের শিরদাঁড়ায় লাগল। সে বিকট গর্জন করে পড়ে গিয়ে ঝোপঝাড় আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে শেষটায় মরে গেল। রবি শুধু দর্শক ছিল, তার মনে হয়েছিল বাঘটার প্রাণ বেরতে যেন বড় বেশি সময় লাগল।

আরেকবার তারা বাঘ শিকারে গিয়েছিল। এবার হাতির পিঠে চড়ে। সেই সময় অবস্থাপন্ন লোকেরা হাতি পুষতেন। হাতি মন্থরগতিতে চলতে লাগল, মাঝে মাঝে আখের খেত থেকে আখ ভেঙ্গে খেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা জঙ্গলে ঢুকলো।

রবি গল্প শুনেছিল বাঘেরা হাতি দেখলেই আক্রমণ করে আর হাতিও প্রাণভয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড় দেয়, তাতে তার পিঠের আরোহীদের যৎপরনাস্তি কষ্ট পেতে হয়। রবির সেইজন্য একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

হঠাৎ হাতি থেমে গেল আর মাহুতও তাকে চলবার জন্য কোনো চেষ্টা করল না। হঠাৎ দিনের আলোয় খোলা জমির উপর দিয়ে একটি বাঘ ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল। কেউ বন্দুক ছুঁড়তে পারল না। তার সেই অদ্ভুত সুন্দর চেহারা ও দেহ সৌষ্ঠব দেখে সকলে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। রবির এই রকম বাঘ শিকারই ভাল লাগত, যেখানে কোনো রক্তপাত নেই। এর কিছুদিন পর তারা আবার জোড়াসাঁকো ফিরে গেল।

জ্যোতিদাদা মাঝে মাঝেই হুগলীর উপর বাগানবাড়ি ভাড়া করতেন। রবি তার সঙ্গে সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসত। তার বয়স এখন ষোল বছর এবং ইতিমধ্যে সে অনেকগুলো কবিতা লিখেছে। রবি তাকিয়ে

দেখত বাইরে প্রবল বৃষ্টি আর হাওয়াতে গাছগুলো নুইয়ে পড়ছে, নদীর ধারে ঘাটের সিঁড়িতে ঢেউ আছড়িয়ে পড়ছে আর ছোট ছোট ডিঙি নৌকা হাওয়ায় পাল তুলে স্রোতের টানে তীরবেগে ছুটে চলেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বিদ্যাপতির বর্ষার গানের দুটি কলি। বিদ্যাপতি ছিলেন এক প্রাচীন মৈথিলী কবি। তাঁর পুরনো গানে সুর দিয়ে রবি পরে লিখেছিল, "আমি ঐ কবিতায় সুর দিয়ে নিজের করে ফেলেছি।"

ছাদের এক কোণায় বসে জ্যোতিদাদা রোজ সকালে কফি খেতেন আর রবিও ছেলে বয়সে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত।

জ্যোতিদাদার লেখা নাটকগুলো সাধারণতঃ সামনে কাকার বাড়ি কিম্বা বড় উঠোনে মঞ্চস্থ করা হত। তিনি রবিকে ছাদে ডেকে এনে নিজের লেখা নতুন নাটক পড়ে শোনাতেন। মাঝে মাঝে রবির মন্তব্য জানতে চাইতেন, আবার মাঝে মাঝে রবিকে বলতেন তাঁর জন্য গান লিখে দিতে। রবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। আজ পর্যন্ত ঐ নাটকগুলোর সঙ্গে সেই গান গাওয়া হয় আর শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে একজন অপরিণত বয়সের ছেলে সেগুলো লিখেছিল। রবি 'ভারতী' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখত, তাতে মাঝে মাঝে নামকরা লেখকদের লেখার খুঁত ধরে দিত। এইসব লেখা পড়ে বেশ বোঝা যায় যে লেখক বয়সে তরুণ ও অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জন্মগত শক্তিসম্পন্ন।

ষোল বছর বয়সে রবি শুধু একজন আশাপ্রদ লেখক ও সঙ্গীতানুরাগী ছিল না, তার চেহারাও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রবি যে সত্যি বড় হয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তার বড় দাদা দিদিরা সেটা লক্ষ্য করলেন।

দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবি, দার্শনিক ছাড়া একজন নামকরা সাঁতারু ছিলেন। তিনি রবিকে সাঁতার শেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। ফলে রবি

দক্ষ সাঁতারু হয়ে উঠেছিল ও একবার শিলাইদহের কাছে পদ্মানদী সাঁতরে পার হয়েছিল।

লোকে ভাবে যে কবিরা সাধারণতঃ দুর্বল ও অক্ষম হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিল দীর্ঘ চেহারা, শরীরে ও মনে ছিল অসীম শক্তি ও সাহস, যার জন্য সে যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারত।

নয়

রবি যত বড় হতে লাগল ও নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে আরম্ভ করল, তার দাদা দিদিরা ততই চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরা ভাবতেন এ রকম ভাবে কতদিন আর কাটবে? স্বাস্থ্যবান ছেলে, প্রায় সতেরো বছর বয়স হল, অথচ গান গেয়ে, গল্প লিখে, বাড়িতে বসে জীবনটাকে এইভাবে নষ্ট করছে। তাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজেব জন্য তৈরি হতে হবে।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন যে রবিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হক। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তখন ইংলণ্ডে, সুতরাং রবির একা লাগবার সম্ভাবনা নেই। রবি প্রথমে তাঁদের সঙ্গে থেকে বিলিতি আদব কায়দা শিখুক। তারপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে আইন পড়ুক। সে নিঃসন্দেহে একজন ভাল ব্যারিস্টার হতে পারবে, কারণ তার চেহারা সুন্দর ও শব্দের উপর চমৎকার কর্তৃত্ব রয়েছে। অবশ্য তাকে আরো ভাল করে ইংরাজি শিখতে ও বলতে হবে। তাছাড়া তাকে শিখতে হবে ব্রিটিশ সমাজে শৌখীন ভদ্র পরিবারের ছেলেরা কেমন আচার-ব্যবহার করে।

এসব জিনিস রবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে শিখতে পারবে না। তাই স্থির হল সে আমেদাবাদে কয়েকমাস কাটিয়ে কেতাদুরস্ত হয়ে আসবে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে জজ ছিলেন ও শহরের সমস্ত সেরা নামকরা

লোকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর কাছে ইংরাজি বইয়ের চমৎকার সংগ্রহ ছিল। রবি যদি তাঁর লাইব্রেরিতে বসে বইয়ে ডুবে যায় তাহলেও সে অনেকখানি ইংরাজি ভাষা শিখে নিতে পারবে। আর বোম্বাইতে বন্ধুদের কাছ থেকে বিলিতি আদব-কায়দাও রপ্ত করতে পারবে।

রবি এ সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। তার নতুন জিনিস দেখতে ও নতুন কিছু শিখতে ভাল লাগত। জোড়াসাঁকোর বাড়ি তার অতি প্রিয়, কিন্তু কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসতে পারলে খুবই ভাল লাগবে।

আমেদাবাদে জজ সাহেবের বাড়িটি রবির আশাতীত ছিল। বাড়ির নাম শাহীবাগ। পুরনো বাড়ি, মুসলমান আমলে বাদশাহদের তৈরি। চওড়া বারান্দাটি সবরমতী নদীর উপর। বালির উপর বেগমদের স্নানের ঘরের ভগ্নাবশেষ রবির চোখে পড়ত। অতি রমণীয় জায়গা। বিশাল ঘরগুলো খাঁ খাঁ করত। সত্যেন্দ্রনাথ কোর্টে চলে গেলে সারা বাড়িতে চাকর বাকর ছাড়া রবি একা।

এঘর ওঘর ঘুরে রবি কল্পনার চোখে দেখতে পেত সেই সব জাঁকজমকধারী পুরুষদের যারা এক সময় এই বাড়িতে বাস করত। পরে বাকি সময় ইংরাজি বই পড়ত। তার কিছু কিছু মানে অভিধান খুঁজে বের করত, বাকি মানে না বুঝেই পড়ে যেত। শব্দের মধুর আওয়াজ উপভোগ করায় বাধা পড়ত না। অজানা, অচেনা শব্দে ভরা বই পড়তে রবির চিরদিন ভাল লাগত।

রাত্রে রবি একা চিলকোঠার ঘরে শুত। খোলা জানলা দিয়ে বাতাস হু হু করে বয়ে যেত। ঘরের ভিতর একটা বোলতার চাক ছিল, সেখান থেকে বোলতা বেরিয়ে রবিকে হুলও ফুটিয়েছিল।



রবীন্দ্রনাথ, যখন বয়স সতের

রবির জীবনে আরেক নতুন পর্ব শুরু হল। সব অদল বদল হয়ে যেতে লাগল। সে বই পড়ত আর খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। রাত্রে একা নির্জন বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াত। এখানেই সে প্রথম কবিতা লিখে তাতে গানের সুর দিল। এর আগে সে শুধু বিদেশী সুরের জন্য কথা লিখে গিয়েছিল, সেগুলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর পিয়ানোতে বাজিয়ে ছিলেন। তাছাড়া অনেক গানের কথা লিখেছিল, সেগুলোতে অন্যরা সুর দিয়েছিল কিম্বা অন্যলোকের লেখা গানে সুর দিয়েছিল মাত্র। এবার নিজের উপর তার এতখানি বিশ্বাস জন্মাল যে নিজের গানে নিজেই সুর দিতে আরম্ভ করল। এই কয়েকমাস তার জীবনে এক নতুন সন্ধিক্ষণ এনে উপস্থিত করেছিল, তার মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। বহু

বছর পরে এই বাড়ির কথা মনে করে সে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় গল্প লিখে নাম দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এই সময় রবি যে সব গান লিখেছিল তা আজ পর্যন্ত গাওয়া হয়।

রবি খুব আনন্দের সঙ্গে শাহীবাগে দিনগুলি কাটিয়ে ছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাকে বোম্বাই যেতে হল বিলিতি আদব-কায়দা শেখার জন্য। বোম্বাই প্রবাসও তার ভাল লেগেছিল। যাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, তাঁরা যে কেতাদুরস্ত ছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁদের সহৃদয়তার ও সহানুভূতির কোন সীমা ছিল না। সেই বাড়ির একটি অল্প বয়সী মেয়ের কাছ থেকে রবি অনেক কিছু শিখেছিল। মেয়েটির প্রতি রবির মন শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল ও পরে তার স্মৃতিতে অনেক কবিতাও লিখেছিল। দুঃখের বিষয়, মেয়েটি খুব কম বয়সে মারা যায়।

আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে ছ'মাস থাকার পর রবির অভিভাবকরা মনে করলেন এবার রবির ইংলণ্ড যাবার সময় হয়েছে। রবি বাড়িতে লম্বা অত্যন্ত কৌতুককর চিঠি লিখত, তাতে কি দেখেছে, কি মনে হয়েছে সব কিছুরই বিস্তারিত বর্ণনা থাকত। এই চিঠিগুলো পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

1878 সালে 20 সেপ্টেম্বর বোম্বাই থেকে বিকেল 5টার সময় রবির জাহাজ 'পুণা' বন্দর ছেড়ে ভেসে পড়ল। একা রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রবি দেখতে লাগল জাহাজ ও জেটির মধ্যে জলের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে!

তার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেল, শুধু যে দেশের মাটি ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে তা নয়, তার নিজের ছেলেবেলাকেও অনেক পিছনে ফেলে যাচ্ছে। সে ডেক ছেড়ে নিজের কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দশ

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গল্প এইখানেই ফুরিয়ে গেল। আঠারো মাস পরে রবির বাবা তাকে দেশে ফিরে আসতে বললেন। এবার তার প্রাপ্ত বয়স হয়েছে, তার উপযোগী কাজের ভার নিতে হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে সে গুরুত্বপূর্ণ লেখা আরম্ভ করে দিল। অনর্গল ধারায় তার কলম থেকে বেরোতে লাগল প্রবন্ধ, নাটিকা, গান, কবিতা ও গল্প। লেখার পারদর্শিতায় সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা তার লেখার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতে বাদ রাখেনি।

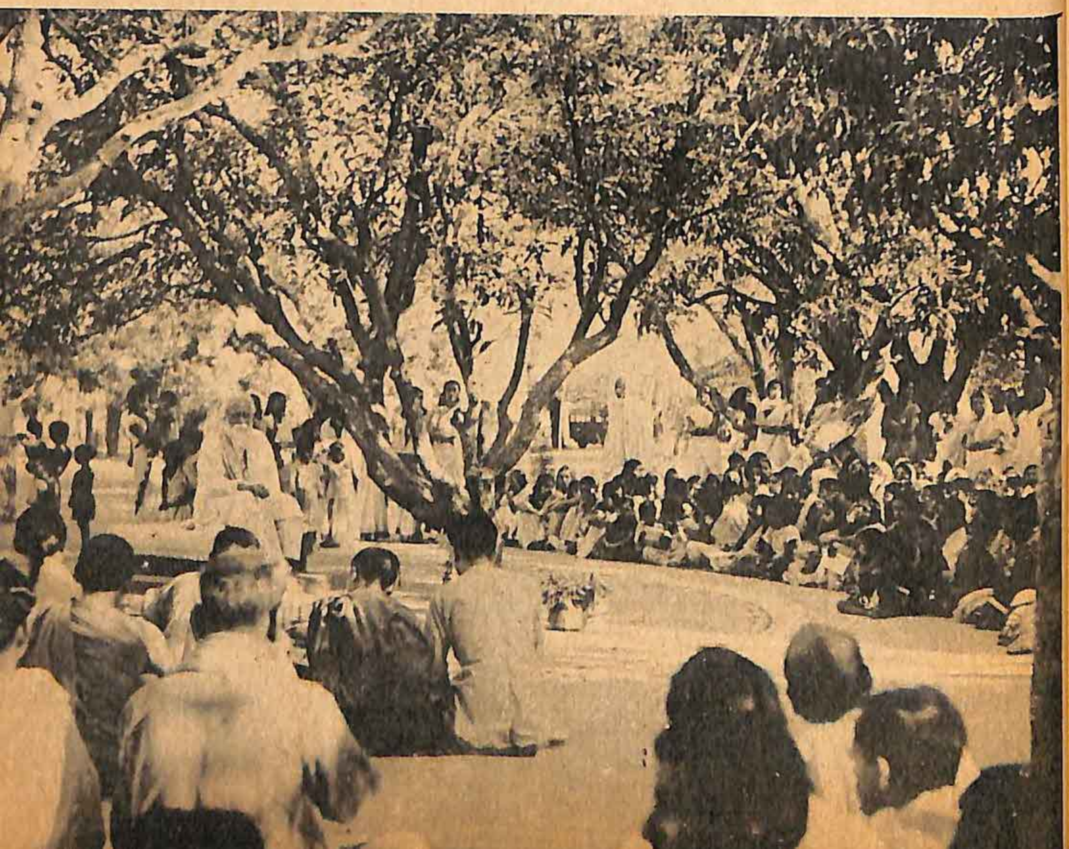
স্কুল তার একেবারেই ভাল লাগত না, এমন কি লণ্ডনেও নয়। 1902 সালে মাত্র কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে সে নিজের মনোমত স্কুল খুলল শান্তিনিকেতনে। সেখানে লেখাপড়া ও পরসেবার মধ্যে দিয়ে সকলে খুব সাদাসিধা জীবনযাপন করতে লাগল। ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় ক্লাস বসত। প্রত্যেক ঋতুকে আবাহন জানানো হত গান, নাচ ও নাটিকার মধ্য দিয়ে। শহরের কৃত্রিম জীবনযাত্রা থেকে বহু দূরে, প্রকৃতির বুকের মধ্যে, সকলে বাস করতে লাগল। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়েকজন ছাত্র পাঠালেন শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করবার জন্য। কালক্রমে সেই ছোট্ট স্কুল বিরাট আকার ধারণ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল, যেখানে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আদর্শগুলিকে মেনে চলবার চেষ্টা হয়।

1913 সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' পেলেন। কিন্তু প্রায় সব টাকাই খরচ হল শান্তিনিকেতনের উন্নয়নের জন্য।

মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও শান্তিনিকেতনের স্কুল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন! দুঃখের বিষয়, তিনটি কন্যা ও দুটি পুত্র রেখে অকালে তিনি মারা যান। তাদের মধ্যে শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। বাকি সকলে খুবই অল্প বয়সে মারা যায়।

জীবনে এতগুলো কঠোর শোকের ছায়া পড়া সত্ত্বেও কবির কাজে কোন

আমকুঞ্জে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ



ব্যাঘাত ঘটতে পারেনি। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর নাম। গান, কবিতা, গল্প, নাটক প্রত্যেকটির মধ্যে ভাবে ও দরদে রয়েছে স্বতন্ত্র ছাপ—কিন্তু সেই সঙ্গে পরিচয় পাওয়া যায় সিংহের মত নির্ভীক চিত্তের, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনো যে পিছপাও হয় না। ভগবানের প্রতি ছিল তাঁর অটল নিষ্ঠা আর ছিল বিশ্বাস সে সত্যের কখনো পরাজয় হবে না। তাঁর গান ও নাটক অমর হয়ে থাকবে, তার মধ্যে অনেকগুলো কৌতুক ও পরিহাসে ভরপুর।

সেই সময় ব্রিটিশরাজ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে খেতাব দিয়েছিল 'নাইট-হুড্' এর। কিন্তু 1919 সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ দেশবাসীর উপর ব্রিটিশদের নৃশংসভাবে গুলি চালানোর কথা শুনে সেই উপাধি তিনি ঘৃণার সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

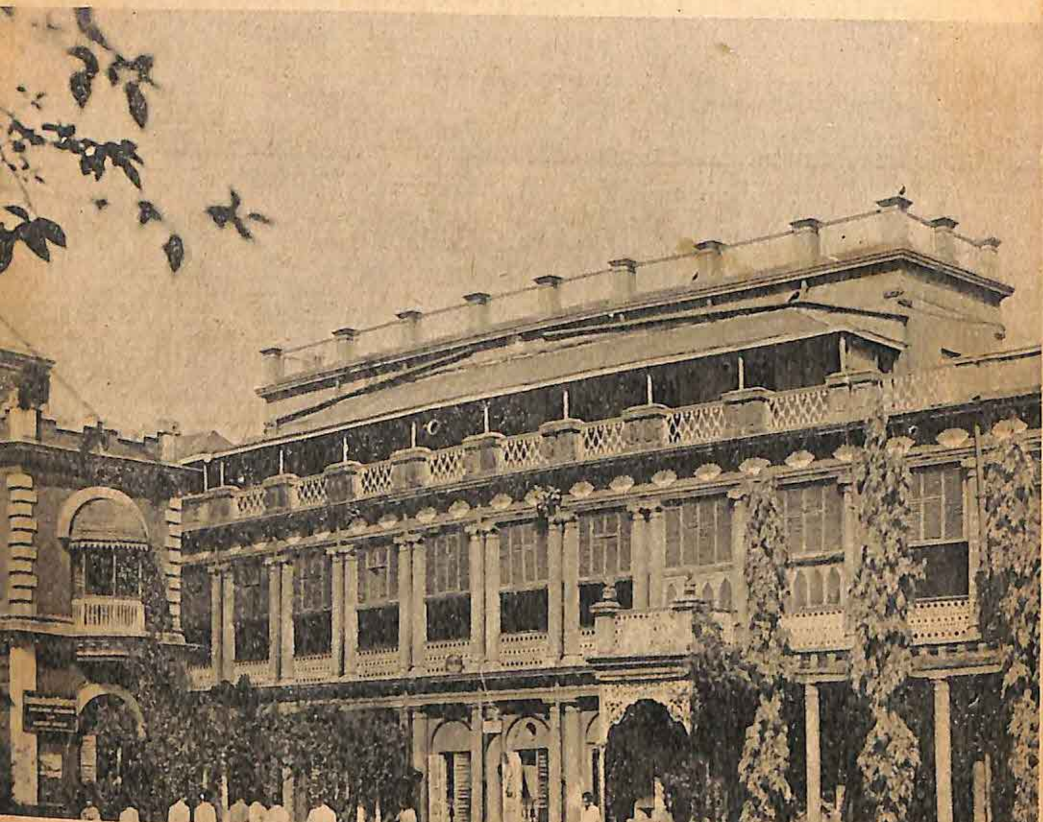
রবীন্দ্রনাথ ভারত ও ভারতীয়দের গভীরভাবে ভালবাসতেন। অপূর্ব সব প্রাচীন ভারতীয় রীতি-নীতি, পূজা-পার্বনকে জাগিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের দুর্বলতাকে তীক্ষ্ণ নিন্দা করতেন। আমাদের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন' সুর ও কথা তাঁরই লেখা। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে তিনি পৃথিবীর লোককে ভারতীয় চিন্তাধারাকে সম্মান করতে শিখিয়েছিলেন গান ও বইয়ের মধ্য দিয়ে।

1941 সালে আশী বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারের কেউ আর এখন জীবিত নেই। কয়েক বছর আগে তাঁর একমাত্র দৌহিত্রীরও অকালে মৃত্যু হয়।

সেই পুরনো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, সেখানে অন্যান্য বিষয় ছাড়া সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য অভিনয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ বাড়ি ও জমি কিনে নিয়ে তার প্রচুর উন্নয়ন করেছেন। সারা পৃথিবী থেকে গুণমুগ্ধ লোকেরা আসে সেই বাড়ি দর্শন করার জন্য।

কিন্তু ঠাকুর পরিবারের আর কেউ সেখানে বাস করে না। সেই বিশাল ঘরগুলি নীরব, প্রাণহীন; শুধু কয়েকটিকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদর্শনঘর বা 'মিউজিয়াম' করে রাখা হয়েছে। সেই পুরনো উদ্দীপনা যার জন্যে সারা বাড়ি গান, বাজনা, সাহিত্যচর্চা ও দীপ্তিময় আলাপ আলোচনায় গমগম করত, সে আজ নিবে গিয়েছে। বাকি আছে শুধু তার স্মৃতিটুকু।

এখনকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এটা এখন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়



রবীন্দ্রনাথের
রচনা থেকে
কিছু উদ্ধৃতি

ছেলে বেলা

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মত জবুস্থবু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনো ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসেনি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাঙলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড় গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নিচে, তখনো বি এ ডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয়নি।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হোত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নিচে তবু তোশাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

সেই তোশাখানার দক্ষিণভাগে বড়ো একটা ঘরে কাচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জ্বলছে মিটমিট করে, গণেশ মার্কা ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারই আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই : মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি, আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়ি-ঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুলগাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকি গাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হোলো পাউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হোলো, আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচা-পাকা, মুখের উপর টান-পড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব-মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত নামডাকওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি, গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ী ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। "বাবুরা বসে আছেন" না বলে সে বলত "অপেক্ষা করে আছেন"। শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেল-ভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাত বার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চালচলনে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ঠিক নয় এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এদিকে তার ঘাড় ছিল কিছু বাঁকা, তাতে কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, "আর দেব কি?" কোন্ উত্তর তার মনের

মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, "চাইনে।" তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করতো না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামান্য রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প-খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকে দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনো শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হোলো না। কার্তিকমাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুসখুসুনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদ-হজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাইনি পেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয়নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, "আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।" আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হোত, তার উপরে খেতে হোত কানমলা। হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর ওয়েল। চিরকালের জন্যে আরাম হোত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে, তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার, থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখিনি। ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর ওয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার

সঙ্গে এলাচ-দানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোড়া কাটা ছুরির আঁচড় পড়েনি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানিনে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নিরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তাহলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার খরচা, বিশেষ করে এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল-দেওয়া ঘি-তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনো বাজারে চকোলেট দেখা দেয়নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি রেউড়ি। গোলাপি গন্ধের আমেজ দেওয়া এই তিলে ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চট্‌চটে করে তোলে কিনা জানিনে। নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মশলার ঠোঙা গেল কোথায় আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনো টিকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর-সমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হুহু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। "ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।" তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝকঝক করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাৎলানো। কিশোরী চাটুজ্যের সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে,

দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভরতি হোতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আসত, মাদুর পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চকচকে, মস্ত তক্তাপোশের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে, তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, "জ্বালাতন করলে! যাও, খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।" আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে হাত পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হোত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম প্রহরে শেয়াল ডেকে উঠত। তখনো শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নিচে ফুকরে উঠত।

[তৃতীয় অধ্যায়]

তোতা-কাহিনী

(১)

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত ; জানিত না কায়দা-কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

(২)

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, 'উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী?'

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৩)

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথি লিখকদের তলব করিলেন। তাহারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রইল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তোতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

(৪)

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের; ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিস্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

(৫)

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য ! শব্দ কম নয় !'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয় ; পিছনে অর্থও কম নাই ।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি ?'

রাজার চমক লাগিল ; বলিলেন, 'ওই যা ! মনে তো ছিল না । পাখিটাকে দেখা হয় নাই ।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই ।'

দেখা হইল । দেখিয়া বড়ো খুশি । কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না ; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে । রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই । খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই ; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে । গান তো বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা । দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয় ।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের কান যেন আচ্ছা করিয়া মলিয়া দেওয়া হয় ।

(৬)

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর মত আধমরা হইয়া আসিল । অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক । তবু স্বভাবদোষে সকাল বেলার আলোর দিকে

পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'একি বেয়াদবি !'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কাথার আসিয়া হাজির : কী দমাদ্দম পিটানি ! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

(৭)

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।

নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি !'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায় ?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম।'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

[লিপিকা]

কবিতা

নটরাজ নৃত্য করে
নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্প রঙে
শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাহারি অক্ষয় নৃত্য
হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব,
তোমার লিখনে॥

[লেখন]

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।

ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাত কড়ি যে
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

[মহাত্মা গান্ধী]

এই সিরিজের অন্যান্য বই

কাশ্মীর	…	মালা সিং অনু : মহাশ্বেতা দেবী
সে অনেক কালের কথা (২য়)	…	এম. চোকসি ও পি. এম. যোশী অনু : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
বাপু (১ম ও ২য়)	…	এফ. সি. ফ্রিটাস অনু : মহাশ্বেতা দেবী
সকলের সাথী সবার বন্ধু	…	উমাশঙ্কর যোশী অনু : ক্ষিতীশ রায়
সোনার অভিযান	…	তারা তেওয়ারী অনু : আদিত্য সেন
ফুল ও মৌমাছি	…	অশোক দাবার অনু : ইন্দ্রাণী সরকার
অযোধ্যার রাজকুমার	…	হংস মেহতা অনু : বুদ্ধদেব ঘোষ
রেডক্রস কাহিনী	…	কৃষ্ণ সত্যানন্দ অনু : মহাশ্বেতা দেবী
রূপা নামে হাতিটি	…	মিকি প্যাটেল অনু : আদিত্য সেন

প্রতিটি বইয়ের দাম দেড় টাকা

